Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির বৈবাহিক জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: আনিকা খাতুন

রোলঃ 23100120486

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির বৈবাহিক জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: আনিকা খাতুন

রোলঃ 23100120486

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নবীজির বৈবাহিক জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা: আনিকা খাতুন, আইডিঃ 23100120486 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নবীজির বৈবাহিক জীবন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Anika

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মোছা: আনিকা খাতুন

আইডিঃ 23100120486

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 2
নবীজির জীবনী 4
কোরআনের আলোকে নবীজির বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী 5
নারীদের বিষয়ে কেমন ছিলেম রাসুল (সা.) 8
নবীজির পবিত্র স্ত্রীগন 11
নবীজির স্ত্রীদের যেভাবে শিক্ষা দিতেন 12
নবীজির সন্তানদের সাথে আচরণ ও দ্বীন শিক্ষা 15
নবীজির নাতিদের সাথে আচরণ ও শিক্ষা 18
নবীজির জীবনে পারিবারিক সমস্যা ও সমাধান 21
নবীজির স্ত্রীদের পরিচয় ও বৈবাহিক জীবনের গল্প 24
হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.) 24
হযরত সাওদা বিনতে জামআ (রা.) 44
হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা) 49
হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.) 69
হযরত জয়নব বিনতে খুজাইমা (রা.) 80
হযরত উম্মে সালামা (হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়্যা) (রা.) 86
হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা.) 93
হযরত জুয়াইরিয়্যা বিনতে আল হারিস (রা.) 103
হযরত উম্মে হাবিবা (রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান) (রা.) 110
হযরত সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা.) 118
হযরত মাইমুনা বিনতে আল হারিস (রা.) 129

নবীজির বৈবাহিক জীবন

রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
»النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاء«ٌ

বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত অনুযায়ী আমল করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ করো, কারণ আমি কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের সামনে তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব। যার সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে, আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন রোজা রাখে—কারণ রোজা তার কামনা দমন করে।
(সুনানে ইবনে মাজাহ ১৮৪৬)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে নেয়।কারণ এটি দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে।আর যারা বিয়ে করতে সক্ষম নয়, তারা যেন রোজা রাখে। কারণ রোজা তার জন্য ঢালস্বরূপ (পাপ থেকে রক্ষা করে)
(সহিহ বুখারী ৫০৬৬)

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
"আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই, তিনি একক তার কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান"
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা", **الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ** যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও অসীম দয়ালু। যার হাতে রিজিকের চাবিকাঠি। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি নেয়ামত মহান আল্লাহর দান। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে এক বিশেষ নিয়ামত হলো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।
আল্লাহ বলেন -
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء
"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন"
[সূরা নিসা- ৪]

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি বিশ্বজগতের একমাত্র মালিক।অফুরন্ত দরুদ ও সালাম প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এবং তার পরিবারবর্গের উপর এবং তার সাহাবাদের উপরও।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আদর্শ পুরুষ, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, এবং আদর্শ নেতা, আদর্শ বন্ধু, এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। যারা তাকে নিয়ে যত বেশি জেনেছেন তত বেশি ভালো বেসেছেন।চৌদ্দশ বছর পরও তার ওপর শ্রদ্ধা ও মুগ্ধতা এতোটুকুও কমেনি।

আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন বিধান ইসলামের প্রতিটি জীবন-বিধান অনুসরণের মাধ্যমে
 রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যা সর্বকালের সব মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ط
অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।
(আল-আহযাব ৩৩:২১)

স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাতায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী বলেছেন।
আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র কেমন ছিল। তিনি উত্তরে বলেছেন “পবিত্র কোরআন কারীম ই তার চরিত্র”
প্রিয় নবীজি রসূল সা: এর পবিত্র জীবনী মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা, অনুকরণীয় জীবনাদর্শ। তার জীবনকে ঘিরেই ইসলামের ইতিহাস। আল্লাহ তা'আলা তাকে অধিষ্ঠিত করেছেন সুমহান চরিত্রে। অনুপম শিষ্টাচার দিয়ে সাজিয়েছেন তার পবিত্র জীবনকে। পুত-পবিত্র স্ত্রীদেরকে দিয়ে তার বৈবাহিক জীবনকে করেছেন মনোমুগ্ধকর।
স্ত্রীদের সাথে নবীজি সা: এর সম্পর্ক ছিল মধুর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ। তাদের সাথে তাঁর আচরণ সর্বকালের সবার জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। নবীজির জীবনী পড়ে আমরা জানতে পারি, তিনি তাঁর স্ত্রীদের প্রতি খুবই দয়ালু ও সহনশীল ছিলেন। তিনি বলতেন, মুমিনদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট তারাই, যারা চরিত্রে উত্তম এবং যারা তাদের পরিবারের প্রতি করুণাময়। নবীজির জীবনাদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনে একইসাথে আল্লাহর পুরস্কার ও স্ত্রীদের প্রেম ও ভালোবাসা লাভ করতে পারি।

নবীজির জীবনী

নবীজির জীবনীর প্রধান প্রধান দিকগুলোকে কয়েকটি ভাগে আলোচনা করা হলো:-

১. শৈশব ও যৌবনকাল (নবুয়তের আগের জীবন)

- **জন্ম ও বংশ:** ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে বনু হাসিম গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের আগেই তাঁর পিতা আবদুল্লাহ এবং শৈশবেই মাতা আমিনা ইন্তেকাল করেন।

আল-আমিন উপাধি: ছোটবেলা থেকেই তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা এবং উত্তম চরিত্রের কারণে মক্কাবাসী তাঁকে 'আল-আমিন' (বিশ্বস্ত) উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

২. নবুয়ত লাভ ও মক্কী জীবন

- **ঐশী বাণী লাভ:** ৪০ বছর বয়সে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় তিনি প্রথম ওহী (পবিত্র কুরআনের আয়াত) লাভ করেন এবং নবুয়ত প্রাপ্ত হন।
- **ধৈর্য ও সংগ্রাম:** মক্কায় তাওহীদের (একত্ববাদ) দাওয়াত দিতে গিয়ে তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা মক্কার কাফেরদের দ্বারা তীব্র নির্যাতন ও চরম বাধার সম্মুখীন হন, কিন্তু তিনি সব পরিস্থিতি ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেন।

৩. হিজরত ও মাদানী জীবন

- **মদিনায় হিজরত:** মক্কাবাসীদের তীব্র বিরোধিতার মুখে আল্লাহর আদেশে তিনি ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন। এখান থেকেই ইসলামিক ক্যালেন্ডার বা হিজরি সনের শুরু।
- **আদর্শ সমাজ গঠন:** মদিনায় গিয়ে তিনি 'মদিনা সনদ' এর মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ এবং আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

৪. পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ

পরিবারের প্রতি আচরণ: তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত মধুর, যত্নশীল এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন। তাঁর একটি বিখ্যাত বাণী হলো: *"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।"*

- *"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।"*

ক্ষমা ও উদারতা: মক্কা বিজয়ের দিন তিনি তাঁর চরম শত্রুদেরও নিঃশর্ত ক্ষমা করে দিয়ে উদারতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

নবীজি (সাঃ) এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

কোরআনের আলোকে নবীজির বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

কুরআনের আলোতে নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন এবং তাঁর চরিত্র কেমন ছিল, পবিত্র কুরআনে তা অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.)-কে যখন নবীজির চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন
:
> "পবিত্র কুরআনই হলো তাঁর চরিত্র।" (সহীহ মুসলিম)
>
অর্থাৎ, কুরআনে যে সমস্ত ভালো কাজের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং যা কিছু নিষেধ করা হয়েছে, তার বাস্তব রূপই ছিল নবীজির জীবন। পবিত্র কুরআনের আলোকে তাঁর জীবনের প্রধান কিছু দিক নিচে তুলে ধরা হলো:

১. উত্তম আদর্শ (উসওয়াতুন হাসানাহ)
আল্লাহ তাআলা পুরো মানবজাতির জন্য নবীজির জীবনকে একটি সর্বোত্তম অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

* **কুরআনের এরশাদ হয়েছে :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ط

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।

(সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১)

২. বিশ্ববাসীর জন্য রহমত

নবীজি কেবল মুসলমানদের জন্য নন, বরং পৃথিবীর সব মানুষ, পশুপাখি এবং সমগ্র সৃষ্টির জন্য দয়া ও রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

* **কুরআনে এরশাদ হয়েছে:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"*

(সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদের (সঃ) উপর অবতারিত পূর্ণ উপদেশ বাণী রয়েছে ঐ সম্প্রদায়ের জন্যে যারা ইবাদত করে। যারা আমাকে মেনে চলে এবং আমার নামে নিজেদের প্রবৃত্তিকে দমন করে।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি শুধু রহমত বা করুণী রূপেই প্রেরণ করেছি। সুতরাং যারা এই রহমতের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তারা হবে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম। পক্ষান্তরে, যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা উভয় জগতে হবে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. সর্বোচ্চ চারিত্রিক মর্যাদা

নবীজির নম্রতা, সততা, ক্ষমাশীলতা এবং মানুষের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল অতুলনীয়। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করেছেন।

* **কুরআনে এরশাদ হয়েছে :

وَاِنَّكَ لَعَلٰي خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

"এবং নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।"
(সূরা আল-কালাম, আয়াত: ৪)

৪. সর্বশেষ নবী ও রাসূল (খাতামুন্নাবিইয়ীন)

নবুয়্যত ও রিসালাতের যে ধারা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু হয়েছিল, মহান মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে।

* **কুরআনে এরশাদ হয়েছে :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।* আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪০)

* মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী; তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না-এ বিষয়টি আল-কুরআনের এই আয়াত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ বরং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেনঃ اَللهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه অর্থাৎ "আল্লাহ্ তাঁর রিসালাত কোথায় রাখবেন তা তিনি খুব ভাল জানেন।" (৬:১২৫) সুতরাং এ আয়াতটি এটাই প্রমাণ করে যে, তার পরে কোন নবী নেই। আর তার পরে যখন কোন নবী নেই তখন তাঁর পরে কোন রাসূলও যে নেই তা বলাই বাহুল্য। রিসালাত তো নবুওয়াত হতে বিশিষ্ট।
*"মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।
৫. আলোর দিশারী ও শিক্ষক

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, নবীজির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনা, কিতাবের শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করা।

* **কুরআনে এরশাদ হয়েছে :

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ

তিনিই উম্মীদের* মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।

*উম্মী দ্বারা আরবের লোকদেরকে বুঝানো হয়।
এক কথায়, কুরআনের প্রতিটি নির্দেশনার বাস্তব এবং জীবন্ত প্রতিফলন ছিল আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর পুরো জীবন।

নারীদের বিষয়ে কেমন ছিলেম রাসুল (সা.)

ইসলাম ধর্মে নারীদের অধিকার, সম্মান এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এক অভূতপূর্ব ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। তৎকালীন অন্ধকার যুগে (আইয়ামে জাহেলিয়াত) যেখানে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো এবং নারীদের পণ্যের মতো বিবেচনা করা হতো, সেখানে রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীদের সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।
নারীদের প্রতি তাঁর আচরণ, নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল, তা নিচে কয়েকটি প্রধান দিক থেকে আলোচনা করা হলো:

১. কন্যাসন্তানের মর্যাদা ও ভালোবাসা

তৎকালীন সমাজে কন্যাসন্তানকে অভিশাপ মনে করা হতো। রাসুল (সা.) এই কুসংস্কার কঠোরভাবে ভেঙে দেন।

- **স্নেহ ও সম্মান:** তিনি তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ফাতিমা (রা.) যখন তাঁর কাছে আসতেন, রাসুল (সা.) উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতেন, তাঁর কপালে চুমু খেতেন এবং নিজের বসার জায়গায় তাঁকে বসাতেন।
- **জান্নাতের সুসংবাদ:** তিনি ঘোষণা করেন, "যে ব্যক্তির তিনটি, দুটি বা একটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে তাদেরকে অবহেলা করবে না, সুশিক্ষা দেবে ও সদ্ব্যবহার করবে, সেই কন্যাসন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হবে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

২. স্ত্রীদের সাথে চমৎকার ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ

রাসুল (সা.) তাঁর স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত রোমান্টিক, সদয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি ঘরের কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করতেন এবং তাঁদের সাথে আমোদ-প্রমোদও করতেন।

- **উত্তম চরিত্রের মাপকাঠি:** তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের নিকট তোমাদের চেয়ে উত্তম।" (তিরমিযী)
- **সহযোগিতা:** হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসুল (সা.) ঘরে কী করতেন? তিনি বলেন, "তিনি ঘরের মানুষের সেবামূলক কাজে (গৃহস্থালি কাজে) ব্যস্ত থাকতেন এবং সালাতের সময় হলে সালাতে চলে যেতেন।" (বুখারী)

৩. মায়ের সর্বোচ্চ সম্মান

ইসলামে মায়ের মর্যাদা বাবার চেয়েও তিন গুণ বেশি দেওয়া হয়েছে, যা রাসুল (সা.)-এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

- এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "আমার সদাচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।"

তৃতীয়বারও তিনি বললেন, "তোমার মা।" চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "তোমার বাবা।" (বুখারী)

- তিনি আরও বলেছেন, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।"

৪. নারীদের অধিকার রক্ষা (সম্পত্তি ও বিয়ে)

রাসুল (সা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নারীদের আইনি ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করেছেন।

- **সম্পত্তির অধিকার:** ইসলামে নারীদের পিতা এবং স্বামী উভয়ের সম্পত্তি থেকে সুনির্দিষ্ট অংশ (উত্তরাধিকার) দেওয়া হয়েছে।
- **বিয়ের সম্মতি:** নারীর সম্মতি ছাড়া জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া রাসুল (সা.) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছেন। কোনো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া হলে রাসুল (সা.) তা বাতিল করে দিতেন।

৫. নারী শিক্ষার গুরুত্ব

রাসুল (সা.) জ্ঞানার্জনকে কেবল পুরুষদের জন্য সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম (নর-নারী)-এর জন্য ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)। তিনি নারীদের দ্বীন ও দুনিয়াবি শিক্ষার জন্য আলাদা সময় দিতেন এবং তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী পন্ডিত এবং চিকিৎসাবিদ্যা ও ইসলামের বিধিবিধানের বড় শিক্ষক।

৬. বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ

রাসুল (সা.) তাঁর জীবনের শেষ প্রধান ভাষণেও (বিদায় হজ্জ) নারীদের বিষয়ে পুরুষদের বিশেষভাবে সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেন:

"হে মানুষ! নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান হালাল করেছ। অতএব, তাদের কল্যাণ সাধন করো।"

সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীদের কেবল দয়া বা করুণার পাত্রী হিসেবে দেখেননি, বরং তাঁদের পুরুষদের সমকক্ষ (অধিকার ও সম্মানের দিক থেকে) এবং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ছিলেন নারী অধিকারের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা

নবীজির পবিত্র স্ত্রীগন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীদের (যাঁদের পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় **'উম্মাহাতুল মুমিনীন'** বা মুমিনদের মা বলা হয়েছে) জীবনী, তাঁদের মর্যাদা এবং তাঁদের সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পারিবারিক জীবন কেমন ছিল, তা জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যন্ত বরকতময় ও শিক্ষণীয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীদের পবিত্র জীবন ও তাঁদের আদর্শ মুসলিম সমাজের জন্য এক অনন্য গাইডলাইন। নিচে তাঁদের পরিচয় এবং পারিবারিক জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

উম্মাহাতুল মুমিনীন (পবিত্র স্ত্রীগণ)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীদের সংখ্যা ছিল **১১** জন। নিচে ক্রমানুসারে তাঁদের নাম দেওয়া হলো:

১. হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.) — রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রথমা স্ত্রী। তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় নবীজী আর কোনো বিয়ে করেননি।

২. হযরত সাওদা বিনতে জামআ (রা)

৩. হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.) — তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদূষী। ইসলামের বহু হাদিস ও ফিকহ তাঁর মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি।

৪. হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)

৫. হযরত জয়নব বিনতে খুজাইমা (রা.) — তাঁর দানশীলতার জন্য তাঁকে 'উম্মুল মাসাকিন' (মিসকিনদের মা) বলা হতো।

৬. হযরত উম্মে সালামা (হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়্যা) (রা.)

৭. হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা.)

৮. হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস (রা.)

৯. হযরত উম্মে হাবিবা (রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান) (রা.)

১০. হযরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.)

১১. হযরত মায়মুনা বিনতে আল-হারিস (রা.)

নবীজীর পারিবারিক জীবন ও দর্শন (আদর্শ)

মহানবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবন ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্ত্রীদের সাথে তাঁর আচরণের মূল দর্শনগুলো ছিল:

- **উত্তম আচরণ:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম।"* তিনি স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করতেন এবং কখনো তাঁদের সাথে কঠোর ব্যবহার করেননি।
- **সমতা ও ন্যায়বিচার:** একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি সবার মাঝে সময়, ভরণপোষণ ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে নিখুঁত সমতা বজায় রাখতেন।
- **দ্বীনি শিক্ষা:** তিনি তাঁর স্ত্রীদের কেবল সাংসারিক কাজেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং তাঁদের দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। যার ফলে হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতো মহান শিক্ষিকা ও হাদিস বর্ণনাকারী তৈরি হয়েছিলেন।

নবীজির স্ত্রীদের যেভাবে শিক্ষা দিতেন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের (উম্মাহাতুল মুমিনীন) শুধু স্ত্রী হিসেবে নন, বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর নারী সমাজের জন্য আদর্শ শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি তাঁদের যেভাবে দ্বীন, নীতি-নৈতিকতা এবং পারিবারিক শৃঙ্খলা শিক্ষা দিতেন, তার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত অনন্য, মনস্তাত্ত্বিক এবং স্নেহপূর্ণ।

রাসুল (সা)-এর শিক্ষা দেওয়ার প্রধান পদ্ধতি ও কৌশলগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. ভালো আচরণের মাধ্যমে মন জয় করে শিক্ষা

রাসুল (সা) বিশ্বাস করতেন, কাউকে শিক্ষা দেওয়ার প্রথম শর্ত হলো তার মন জয় করা। তিনি কঠোরতা বা ধমকের চেয়ে ভালোবাসা ও কোমলতাকে শিক্ষার মাধ্যম বানাতেন।

- **সহমর্মিতা:** হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসুল (সা) ঘরে প্রবেশ করলেই মুচকি হাসতেন। স্ত্রীদের কোনো কাজে ভুল হলে তিনি সরাসরি তিরস্কার না করে অত্যন্ত নরম সুরে বুঝিয়ে বলতেন।
- **ভুল শুধরে দেওয়ার ভঙ্গি:** একবার হযরত আয়েশা (রা) অন্য একজন স্ত্রী (হযরত সাফিয়া রা)-এর উচ্চতা নিয়ে ইঙ্গিত করে বলেন, "তিনি তো খাটো।" রাসুল (সা) তখন রাগ না করে বলেন, *"আয়েশা, তুমি এমন একটি কথা বললে, যা*

যদি সাগরের পানির সাথে মেশানো হতো, তবে সাগরের সমস্ত পানি তিতো বা দূষিত হয়ে যেত।" এই একটি উপমামূলক বাক্য হযরত আয়েশাকে পরনিন্দার ভয়াবহতা আজীবনের জন্য শিখিয়ে দিয়েছিল।

২. প্রশ্নের উত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে তত্ত্বীয় শিক্ষা

তিনি স্ত্রীদের সাথে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে গল্প করতেন, তাঁদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করতেন এবং গভীর মনযোগ দিয়ে উত্তর দিতেন।

- **কৌতূহলকে মূল্যায়ন:** হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও কৌতূহলী। রাসুল (সা) কোনো হাদিস বা দ্বীনি কথা বললে আয়েশা (রা) তা পুরোপুরি না বোঝা পর্যন্ত বারবার প্রশ্ন করতেন। রাসুল (সা) কখনো বিরক্ত না হয়ে নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে দিতেন। এই শিক্ষার ফলেই হযরত আয়েশা (রা) ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান হাদিস বর্ণনাকারী ও ফকীহ (আইনবিদ) হতে পেরেছিলেন।
- **গল্পের ছলে শিক্ষা:** রাসুল (সা) রাতে স্ত্রীদের সাথে অতীতের বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা বা রূপক গল্প শেয়ার করতেন (যেমন বিখ্যাত 'উম্মে যারা'-এর দীর্ঘ হাদিস), যার মাধ্যমে বিশ্বস্ততা, ভালোবাসা এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার শিক্ষা ফুটে উঠত।

৩. বাস্তব ঘটনা ও ইবাদতের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা

রাসুল (সা) শুধু মুখে আদেশ করতেন না, বরং নিজে আমল করে স্ত্রীদের তা শেখাতেন।

- **তাহাজ্জুদ ও রাতের ইবাদত:** রাসুল (সা) যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন, তখন স্ত্রীদেরও ইবাদতের পরিবেশ তৈরি করে দিতেন। বিশেষ করে রমজানের শেষ দশ দিন তিনি নিজে ইবাদতে মগ্ন হতেন এবং পরিবারের সবাইকে ডেকে তুলতেন।
- **যিকিরের শিক্ষা:** একবার তিনি তাঁর স্ত্রী হযরত জুওয়াইরিয়া (রা)-কে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দীর্ঘসময় তাসবীহ পড়তে দেখেন। তিনি তাকে বলেন, *"আমি তোমার পর এমন চারটি বাক্য তিনবার পড়েছি, যা ওজনে তোমার সারা সকালের ইবাদতের চেয়েও ভারী হবে।"* এরপর তিনি তাকে একটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ যিকির শিখিয়ে দেন।

৪. মানসিক সংকটে ওহী এবং ধৈর্যের শিক্ষা

পারিবারিক কোনো বড় সংকট বা টানাপোড়েন তৈরি হলে তিনি স্ত্রীদের আল্লাহর ভয়, তাকওয়া এবং পরকালের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

- **ঈলা বা সচ্ছলতার দাবির শিক্ষা:** স্ত্রীদের অতিরিক্ত দুনিয়াবী চাহিদার মুখে রাসুল (সা) নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন এবং পবিত্র কুরআনের আয়াত (সূরা আহযাব: ২৮-২৯) শুনিয়ে স্পষ্ট শিক্ষা দিয়েছিলেন যে—আল্লাহর রাসুলের ঘর করতে হলে দুনিয়ার জাঁকজমকের চেয়ে আখিরাতকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। এটি তাঁদেরকে ত্যাগের সর্বোচ্চ পাঠ দিয়েছিল।

৫. আত্মমর্যাদা ও সামাজিক শিষ্টাচারের শিক্ষা

উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মর্যাদা সাধারণ নারীদের চেয়ে অনেক উপরে ছিল, তাই তাঁদের সামাজিক আচার-আচরণও ছিল অত্যন্ত মার্জিত।

- **পর্দা ও আত্মমর্যাদা:** তিনি স্ত্রীদের পরপুরুষের সামনে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বর কোমল না করে স্বাভাবিক ও গম্ভীর রাখার শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাতে কেউ সুযোগ নিতে না পারে।
- **দানশীলতার পাঠ:** রাসুল (সা) তাঁর স্ত্রীদের কৃপণতা দূর করে অকাতরে দান করার শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁর স্ত্রী হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা)-কে তাঁর দানশীলতার জন্য অত্যন্ত প্রশংসা করতেন। রাসুল (সা)-এর ইন্তেকালের পর উম্মাহাতুল মুমিনীনরা তাঁদের সমস্ত সম্পদ গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন, যা ছিল রাসুল (সা)-এরই শিক্ষার ফসল।

শিক্ষার ফল: রাসুলুল্লাহ (সা)-এর এই অসাধারণ শিক্ষা পদ্ধতির কারণেই তাঁর স্ত্রীগণ পরবর্তীতে পুরো উম্মতের, বিশেষ করে মুসলিম নারীদের জন্য জ্ঞানের প্রধান উৎসে পরিণত হন। রাসূল (সা)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবীগণও জটিল দ্বীনি ও পারিবারিক সমস্যার সমাধানে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের (বিশেষ করে হযরত আয়েশা ও হযরত উম্মে সালামা) শরণাপন্ন হতেন।

নবীজির সন্তানদের সাথে আচরণ ও দ্বীন শিক্ষা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একজন মহান নেতা বা নবী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত স্নেহময়, দায়িত্বশীল এবং আদর্শ বাবা ও দাদা। তৎকালীন আরব সমাজে যেখানে কন্যা সন্তানদের অবহেলা করা হতো এবং সন্তানদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ দেখানোকে পুরুষত্বের পরিপন্থী মনে করা হতো, সেখানে রাসুল (সা) সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা ও মায়ার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।
তাঁর নিজের সন্তান (যাঁদের মধ্যে কেবল হযরত ফাতিমা রা. দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন) এবং দৌহিত্রদের (হাসান ও হুসাইন রা.) সাথে তাঁর আচরণের বিস্তারিত দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. গভীর স্নেহ, চুম্বন ও আলিঙ্গন

রাসুল (সা) সন্তানদের বুকে জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া এবং কোলে নেওয়া অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

- **একটি বিখ্যাত ঘটনা:** একবার রাসুল (সা) তাঁর দৌহিত্র হযরত হাসান (রা)-কে চুমু খাচ্ছিলেন। তা দেখে আকরা ইবনে হাবিস নামক এক বেদুইন নেতা বলল, "আমার ১০টি সন্তান আছে, আমি কখনো তাদের কাউকেই চুমু খাইনি।" রাসুল (সা) তার দিকে তাকিয়ে বললেন: *"যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।"* (সহীহ বুখারী)
- *"যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।"* (সহীহ বুখারী)

    - তিনি সন্তানদের সাথে খেলার ছলে আনন্দ দিতেন। উটের মতো উপুড় হয়ে পিঠে হাসান ও হুসাইনকে বসাতেন এবং বলতেন, "তোমাদের সওয়ারী কতই না চমৎকার!"
- **২. কন্যা সন্তানদের প্রতি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা**

তৎকালীন অন্ধকার যুগে কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়াকে লজ্জার বিষয় মনে করা হতো। রাসুল (সা) এই কুসংস্কার ভেঙে কন্যাদের সর্বোচ্চ সম্মানিত আসন দেন। বিশেষ করে তাঁর ছোট মেয়ে হযরত ফাতিমা (রা)-এর প্রতি তাঁর আচরণ ছিল রাজকীয় সম্মানের মতো।

সম্মানের অনন্য দৃষ্টান্ত: হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, হযরত ফাতিমা (রা) যখনই রাসুল (সা)-এর ঘরে আসতেন, রাসুল (সা) নিজে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতেন, তাঁর কপালে বা হাতে চুমু খেতেন এবং নিজের বসার জায়গায় তাঁকে বসাতেন। আবার রাসুল (সা) যখন ফাতিমা (রা)-এর ঘরে যেতেন, ফাতিমাও দাঁড়িয়ে বাবাকে উএকইভাবে সম্মান করতেন।

- রাসুল (সা) বলতেন, *"ফাতিমা আমার শরীরের একটি অংশ, যে তাকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল।"*

- **৩. সন্তানদের সাথে সুসম্পর্ক ও মান-অভিমান ভাঙানো**

সন্তানদের দাম্পত্য জীবনে কোনো সমস্যা বা মান-অভিমান হলে রাসুল (সা) অত্যন্ত প্রাজ্ঞ অভিভাবকের মতো তা মিটিয়ে দিতেন। কোনো কঠোরতা না দেখিয়ে মৃদু হাসির মাধ্যমে পরিস্থিতি সহজ করতেন।

- **আবু তুরাবের ঘটনা:** একবার হযরত আলী (রা) এবং হযরত ফাতিমা (রা)-এর মধ্যে কিছুটা অভিমান হয়। আলী (রা) রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে মসজিদে নববীর মাটিতে ঘুমিয়ে পড়েন। রাসুল (সা) ফাতিমার ঘরে এসে আলীকে না দেখে মসজিদে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন আলীর পিঠে ধুলাবালি লেগে আছে। রাসুল (সা) পরম ইমমতায় নিজের হাতে আলীর পিঠের ধুলা ঝেড়ে দিতে দিতে হাসিমুখে ডাকলেন, *"ওঠো, হে আবু তুরাব (ধুলার পিতা), ওঠো।"* এতে মুহূর্তের মধ্যেই তাঁদের মান-অভিমান দূর হয়ে যায়।

- **৪. ইবাদতের মাঝেও সন্তানদের প্রতি সহনশীলতা**

রাসুল (সা) নামাজরত অবস্থায়ও সন্তানদের প্রতি কঠোর হতেন না।

- **দীর্ঘ সেজদা:** একবার রাসুল (সা) নামাজে সেজদায় থাকা অবস্থায় তাঁর ছোট দৌহিত্র (হানিফ বা হাসান) তাঁর ঘাড়ে বা পিঠে চড়ে বসে। রাসুল (সা) সেজদা অনেক দীর্ঘ করলেন। নামাজ শেষে সাহাবীরা জিজ্ঞেস

করলেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি সেজদা এত দীর্ঘ করলেন কেন? আমরা ভেবেছিলাম কোনো ওহী নাজিল হচ্ছে বা দুর্ঘটনা ঘটেছে।" রাসুল (সা) হেসে বললেন, *"না, তেমন কিছু নয়। আসলে আমার সন্তানটি আমার পিঠে চড়ে বসেছিল। সে নিজে থেকে নামার আগে তাকে তাড়াহুড়ো করে নামিয়ে দিতে আমার মন চাইল না।"*

- **৫. সন্তানদের পরকালের শিক্ষা ও তাকওয়া গঠন**

তিনি সন্তানদের কেবল দুনিয়াবী স্নেহ-আহ্লাদই দেননি, বরং তাঁদের জান্নাতি মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে দ্বীন ও তাকওয়ার কঠোর শিক্ষা দিয়েছেন।

  - **সতর্কবাণী:** মক্কায় যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করার নির্দেশ আসে, তখন রাসুল (সা) প্রকাশ্য সমাবেশে তাঁর মেয়েকে ডেকে বলেছিলেন, *"হে আল্লাহর রাসুলের কন্যা ফাতিমা! তুমি আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, কিন্তু আল্লাহর দরবারে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না (যদি তোমার আমল ঠিক না থাকে)। অতএব নিজের আমল দিয়ে নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।"*
  - **তসবিহে ফাতেমি:** একবার হযরত ফাতিমা (রা) ঘরের কাজ করতে করতে হাতে ফোসকা পড়ে যাওয়ায় রাসুল (সা)-এর কাছে একজন গৃহকর্মী বা দাসী চাইতে আসেন। রাসুল (সা) তাঁকে দাসী না দিয়ে বলেন, *"আমি কি তোমাকে দাসীর চেয়ে উত্তম কিছু শিখিয়ে দেব না?"* এরপর তিনি তাঁকে রাতে ঘুমানোর আগে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার (তাসবিহে ফাতিমি) পড়ার আমল শিখিয়ে দেন, যা শারীরিক ও মানসিক শক্তি জোগায়।

নবীজির নাতিদের সাথে আচরণ ও শিক্ষা

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর নাতিদের (বিশেষ করে হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন রা.) অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাদের সাথে তাঁর আচরণ এবং তাদের দেওয়া শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল দাদা-নানা এবং পিতামাতার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

তাঁর সেই আচরণ ও শিক্ষার মূল দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. গভীর স্নেহ, ভালোবাসা ও প্রকাশ

রাসুল (সা.) তাঁর নাতিদের প্রতি ভালোবাসা শুধু মনেই রাখতেন না, বরং তা প্রকাশ করতেন। তিনি তাদের জড়িয়ে ধরতেন, চুমু খেতেন এবং কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

- চুমু দেওয়া ও বুকে টেনে নেওয়া: একবার আল্লাহর রাসুল (সা.) হযরত হাসান (রা.)-কে চুমু খাচ্ছিলেন। তা দেখে আকরা বিন হাবিস নামের এক সাহাবী বললেন, "আমার ১০টি সন্তান আছে, আমি কখনো তাদের কাউকে চুমু খাইনি।" রাসুল (সা.) তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, *"যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।"* (সহীহ বুখারী)।
- জান্নাতের যুবক: তিনি প্রায়ই বলতেন, *"হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের সর্দার।"*

২. খেলার ছলে আনন্দ দেওয়া ও কোমলতা

রাসুল (সা.) নাতিদের সাথে অত্যন্ত কোমল আচরণ করতেন এবং তাদের সাথে খেলাধুলায় অংশ নিতেন।

- ঘোড়া সাজা: একদিন সাহাবিরা দেখলেন রাসুল (সা.) দুই হাত ও হাঁটু মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে আছেন আর হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠে চড়ে বসেছেন। রাসুল (সা.) হাসিমুখে বললেন, *"তোমাদের বাহনটি কতই না চমৎকার, আর তোমরা আরোহীরাও কত চমৎকার!"*
- নামাজের সেজদায় ছাড় দেওয়া: রাসুল (সা.) নামাজে সেজদা থাকা অবস্থায় প্রায়ই তাঁর নাতিরা তাঁর পিঠে চড়ে বসত। নাতিদের কষ্ট হবে বা তারা পড়ে যাবে এই ভয়ে তিনি সেজদা দীর্ঘ করতেন, যতক্ষণ না তারা নিজে থেকে নেমে যেত।

৩. ভুলত্রুটিতে স্নেহপূর্ণ সংশোধন (শিক্ষা)

নাতিরা শিশুসুলভ কোনো ভুল করলে তিনি রাগ না করে অত্যন্ত নরম ভাষায় দ্বীনি শিক্ষা দিতেন।

- সদকার খেজুরের ঘটনা: একবার শিশু হযরত হাসান (রা.) সদকার (যাকাতের) একটি খেজুর মুখে পুরে দিয়েছিলেন। রাসুল (সা.) সাথে সাথে তাঁর মুখের ভেতর আঙুল দিয়ে খেজুরটি বের করে আনলেন এবং বললেন, *"ছিঃ, ছিঃ! তুমি কি জানো না যে আমরা (নবীর পরিবার) সদকার মাল খাই না?"*
- শিক্ষা: এখানে তিনি শিশুকে ধমক দেননি, বরং কেন খাওয়া যাবে না তার পেছনের পারিবারিক ও ধর্মীয় নিয়মটি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

৪. সবার সামনে মর্যাদা দেওয়া

রাসুল (সা.) তাঁর নাতিদের সামাজিক মর্যাদা দিতেন, যা শিশুদের আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে।

  - খুতবা থামিয়ে কোলে নেওয়া: রাসুল (সা.) একদিন মসজিদে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় শিশু হাসান ও হুসাইন লাল জামা পরে হেলেদুলে আসছিল এবং পড়ে যাচ্ছিল। রাসুল (সা.) খুতবা থামিয়ে মিম্বার থেকে নেমে এলেন, তাদের দুজনকে কোলে তুলে নিয়ে আবার মিম্বারে গিয়ে বসলেন এবং খুতবা শুরু করলেন।
- ৫. ভবিষ্যৎবাণী ও নেতৃত্ব গঠন

রাসুল (সা.) তাঁর নাতিদের ভবিষ্যৎ পথপ্রদর্শক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দোয়া করতেন এবং তাদের গুণাবলি মানুষের সামনে তুলে ধরতেন।

  - হযরত হাসান (রা.) সম্পর্কে তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, *"আমার এই সন্তানটি নেতা (সাইয়্যেদ)। আশা করা যায় আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করিয়ে দেবেন।"*

(পরবর্তীতে হযরত হাসানের হাত ধরেই মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছিল)।

সংক্ষেপে আমাদের জন্য শিক্ষা:

রাসুল (সা.)-এর এই পবিত্র আচরণ থেকে বোঝা যায় যে, শিশুদের সাথে কঠোরতা নয়, বরং স্নেহ, খেলার ছলে শিক্ষা, এবং ভুল করলে বুঝিয়ে বলা-ই হলো ইসলামি লালন-পালনের মূল ভিত্তি। শিশুদের শৈশবকে আনন্দময় করে তোলা এবং তাদের আত্মসম্মান বজায় রেখে গড়ে তোলাই সুন্নাত

১. শৈশব থেকেই তাওহীদ ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের পাঠ

রাসুল (সা) সন্তানদের একদম ছোটবেলা থেকেই আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস এবং তাঁর ওপর ভরসা করার শিক্ষা দিতেন। নিজের সন্তান ও উম্মতের সন্তানদের তিনি একই পদ্ধতিতে গড়ে তুলেছেন।

- **আল্লাহর ওপর ভরসা:** তাঁর বিখ্যাত একটি শিক্ষা যা তিনি তাঁর চাচাতো ভাই/সন্তানতুল্য ইবনে আব্বাস (রা)-কে ছোটবেলায় পিঠে বসিয়ে শিখিয়েছিলেন: *"হে বৎস! তুমি আল্লাহর বিধানের হেফাজত করো, আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন। যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে; যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, আল্লাহর কাছেই করবে।"*
- **উত্তম কথার সূচনা:** সন্তানরা যখন কথা বলা শিখত, তখন তিনি তাদের আল্লাহর প্রশংসা এবং তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করা শেখাতেন।

২. নামাজের হাতে-কলমে শিক্ষা ও তাগিদ

দ্বীনের প্রধান স্তম্ভ নামাজ আদায়ের ব্যাপারে রাসুল (সা) সন্তানদের শৈশব থেকেই অভ্যস্ত করাতেন।

- **অভ্যাস গঠন:** তিনি সাধারণ উম্মত ও নিজের সন্তানদের লক্ষ্য করে বলেছেন, *"তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদের নামাজ পড়ার নির্দেশ দাও।"*
- **ইবাদতের পরিবেশ তৈরি:** তিনি যখন ঘরে নফল বা তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন, তখন তাঁর সন্তান ও নাতি-নাতনিরা (যেমন হাসান ও হুসাইন) তা দেখতেন এবং তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতেন বা সিজদার সময় পিঠে চড়ে বসতেন। তিনি

আদর করে তাদের নামাজে শামিল রাখতেন, যেন ইবাদতের প্রতি তাদের মনে ভীতি নয়, বরং ভালোবাসা তৈরি হয়।

৩. দোয়া, যিকির ও মাসনুন আমল শিক্ষা

দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজের শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম নেওয়া এবং বিভিন্ন দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে যুক্ত থাকার শিক্ষা তিনি সন্তানদের দিতেন।

- **নাতিদের দোয়া শিক্ষা:** হযরত হাসান (রা) বর্ণনা করেন, *"রাসুলুল্লাহ (সা) আমাকে বিতর নামাজে পড়ার জন্য কিছু বাক্য (দোয়ায়ে কুনুত) শিখিয়ে দিয়েছিলেন: 'আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইত...' (হে আল্লাহ! আপনি যাদের হেদায়েত করেছেন, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন)।"*
- **শয়তান থেকে সুরক্ষার দোয়া:** তিনি তাঁর নাতি হাসান ও হুসাইনকে কাছে ডেকে আল্লাহর বিশেষ কালামের মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক (দম) করতেন এবং বলতেন, তোমাদের মূল পিতা ইব্রাহিম (আ) তাঁর সন্তান ইসমাইল ও ইসহাককে এভাবে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয়ে রাখতেন।

৪. বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে হালাল-হারামের সীমারেখা নির্ধারণ

রাসুল (সা) নাতিদের খুব কঠোর শাসনের মাধ্যমে নয়, বরং তাৎক্ষণিক ও বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে হালাল ও হারামের পার্থক্য বুঝিয়ে দিতেন।

নবীজির জীবনে পারিবারিক সমস্যা ও সমাধান

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পারিবারিক জীবন ছিল মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তবে সাধারণ মানুষ হিসেবে তাঁর পরিবারেও কিছু সাময়িক সমস্যা ও মানসিক টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল, যা তিনি অত্যন্ত ধৈর্য, প্রজ্ঞা এবং ওহীর নির্দেশনার আলোতে সমাধান করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনাগুলো **"পারিবারিক সমস্যা"** হিসেবে নয়, বরং উম্মতের জন্য **"পারিবারিক শিক্ষা"** হিসেবে দেখা হয়।

নিচে রাসুল (সা)-এর পারিবারিক জীবনের প্রধান কিছু ঘটনা ও সমস্যা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

১. অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ও উম্মাহাতুল মুমিনীনদের দাবি

ইসলামের বিজয়ের পর মদিনার অর্থনীতিতে কিছুটা সচ্ছলতা এলেও রাসুল (সা) নিজের এবং তাঁর পরিবারের জন্য অত্যন্ত সাধারণ ও জাহিদানা (সংসারবিমুখ) জীবনযাত্রা বজায় রেখেছিলেন।

- **সমস্যা:** রাসুল (সা)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ (উম্মাহাতুল মুমিনীন) অন্যান্য সাধারণ পরিবারের মতো কিছুটা উন্নত জীবনযাত্রা ও ভরণপোষণের দাবি জানান।
- **সমাধান (ঈলা-র ঘটনা):** রাসুল (সা) এতে ব্যথিত হন এবং প্রায় এক মাস স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকেন। এরপর সূরা আহযাবের (২৮-২৯) আয়াত নাজিল হয়, যেখানে আল্লাহ স্ত্রীদের দুটি অপশন দেন: হয় দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বেছে নিয়ে বিদায় নেওয়া, অথবা আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং আখিরাতকে বেছে নিয়ে সাধারণ জীবনযাপন করা। সব স্ত্রীই সানন্দে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বেছে নেন।

২. স্ত্রীদের মধ্যকার স্বাভাবিক ঈর্ষা (অসূয়া)

মানুষ হিসেবে রাসুল (সা)-এর স্ত্রীদের মধ্যে স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষা ছিল, যা যেকোনো বহুবিবাহের পরিবারে দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে হযরত আয়েশা (রা) এবং অন্য স্ত্রীদের মধ্যে মাঝে মাঝে মান-অভিমান হতো।

- **ঘটনা ১ (মধুপানের ঘটনা):** হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা)-এর ঘরে রাসুল (সা) একটু বেশি সময় কাটাতেন এবং মধু পান করতেন। এতে অন্য কয়েকজন স্ত্রী ঈর্ষাবশত একটি কৌশল করেন এবং রাসুল (সা)-কে বলেন যে তাঁর মুখ থেকে 'মাগাফির' (এক ধরণের দুর্গন্ধযুক্ত আঠা) এর গন্ধ আসছে। রাসুল (সা) গন্ধ পছন্দ করতেন না, তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন আর কখনো মধু খাবেন না। পরবর্তীতে আল্লাহ সূরা তাহরীম নাজিল করে রাসুল (সা)-কে হালাল জিনিস হারাম করতে নিষেধ করেন এবং স্ত্রীদের সতর্ক করেন।
- **ঘটনা ২ (খাবার বাটি ভেঙে ফেলা):** একবার হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে রাসুল (সা) বসা ছিলেন। অন্য এক স্ত্রী (হযরত সাফিয়া বা অন্য কেউ) রাসুল (সা)-এর জন্য খাবার পাঠান। ঈর্ষাবশত হযরত আয়েশা (রা) পরিবেশনকারীর হাত থেকে বাটিটি ফেলে দেন এবং তা ভেঙে যায়। রাসুল (সা) রাগ না করে মৃদু হেসে ভাঙা টুকরোগুলো কুড়াতে কুড়াতে বললেন, "তোমাদের মা ঈর্ষান্বিত

হয়েছেন।" পরে তিনি আয়েশা (রা)-এর অক্ষত বাটিটি ওই স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন।

৩. হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ (ইফকের ঘটনা)

রাসুল (সা)-এর পারিবারিক জীবনের সবচেয়ে বড় এবং বেদনাদায়ক সংকট ছিল এটি।

- **সমস্যা:** বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে হযরত আয়েশা (রা) কাফেলা থেকে সাময়িকভাবে পিছিয়ে পড়েন এবং পরে এক সাহাবীর উটের পিঠে চড়ে মদিনায় ফেরেন। এই সুযোগে মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই হযরত আয়েশা (রা)-এর চরিত্রের ওপর মিথ্যা অপবাদ রটায়।
- **প্রভাব:** মদিনার সমাজ এবং রাসুল (সা)-এর পরিবারে প্রায় এক মাস চরম মানসিক অশান্তি বিরাজ করে। রাসুল (সা) নিজেও গভীরভাবে ব্যথিত ছিলেন।
- **সমাধান:** অবশেষে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সূরা নূরের ১০টি আয়াত নাজিল করে হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা ও নিষ্পাপতা ঘোষণা করেন এবং অপবাদকারীদের শাস্তির বিধান দেন।

রাসুল (সা)-এর সংকট সমাধানের মূল শিক্ষা:

- **ধৈর্য ও সহনশীলতা:** স্ত্রীদের যেকোনো আবেগ বা ভুলের বিপরীতে তিনি কখনো কঠোর বা সহিংস আচরণ করেননি।
- **সমতা রক্ষা:** স্ত্রীদের মধ্যে ভালোবাসা ও মনোযোগের ক্ষেত্রে তিনি সর্বোচ্চ সমতা বজায় রাখতেন।
- **ক্ষমা ও রসিকতা:** পারিবারিক ছোটখাটো ভুলত্রুটিকে তিনি গম্ভীর না করে কখনো কখনো রসিকতা বা ক্ষমার মাধ্যমে সহজ করে দিতেন।

রাসুল (সা) নিজেই বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।" (তিরমিযী)

নবীজির স্ত্রীদের পরিচয় ও বৈবাহিক জীবনের গল্প

হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.)

খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.) ছিলেন মহানবী মুহাম্মদ ﷺ–এর প্রথম স্ত্রী এবং ইসলামের প্রথম বিশ্বাসী ব্যক্তি। তিনি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান।

জন্ম: আনুমানিক ৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ
জন্মস্থান: মক্কা
পরিবার ও পরিচয়
তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যবসায়ী নারী। তাঁর পিতার নাম খুয়াইলিদ ইবনে আসাদ এবং মাতার নাম ফাতিমা বিনতে যায়িদা।
হযরত খাদিজা(রা.) এর জীবনী :
খুওয়াইলিদদের বাড়িটি যেনো হাসি-আনন্দ, স্নেহ-মমতা ও প্রেম-ভালোবাসার এক শ্রেষ্ঠ 'নীড়'। কারণ একটাই; এ-বাড়ির শোভা তদীয় তনয়া খাদিজা। সবার চোখের মণি। সবার আদরের দুলালি। এ-বাড়ির সবাই তাকে ভালোবাসে। তার কাছ-ঘেঁষে বসতে আনন্দ পায়। দাসী ও পরিচারিকারা পর্যন্ত তার নামে আপনহারা। হবেই তো; খাদিজা-যে আদর দিয়ে .. ভালোবাসা দিয়ে .. সখ্যতা দিয়ে ওদের হৃদয়-রানী হয়ে আছেন! খাদিজার ডাকতে দেরি কিন্তু ওদের 'লাব্বাইক মালিকান!' বলতে দেরি হয় না!
খাদিজার সান্নিধ্য ওদের মনের খোরাক।
খাদিজার নির্দেশ ওদের আত্মার প্রশান্তি।
অমন মালিকান কে পায়?
অমন মহামানবী আর আছে কোথায়?
খাদিজা তাই এ বাড়ির শোভা।
এ বাড়ির অহঙ্কার।
এ বাড়ির অলঙ্কার।
কুরাইশ গোত্রে বাবা খুওয়াইলিদদের অবস্থান অনেক ওপরে। তিনি গোত্রের সশ্রদ্ধ নেতা। তাঁর আদেশ-নিষেধ সবাই মেনে চলে। তাঁর মতামত কেউ উপেক্ষা করতে পারে

না। তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই হয় না। সবাই তাঁকে সহযোগিতা করে পাশে থেকে। তাঁর পাশে আছে ঐতিহ্যবাহী বড় পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা। অসহায় দরিদ্রদের প্রতি খুওয়াইলিদ ছিলেন দয়াদিল—মায়াদিল—উদারহস্ত। সব সময় তাঁর বাড়িতে করুণা ও সাহায্যপ্রার্থীদের ভিড় লেগেই থাকে। এমনই পরিবারে জন্ম আমাদের আম্মাজান খাদিজর (রা.)।

অমন অতিথি পরায়ণ .. অমন উদার মমতা-ঢাকা বাড়ির আঙিনাতেই বেড়ে উঠছিলেন খাদিজা। বেড়ে উঠছিলেন বাড়ির অতিথিবৎসল পরিবেশের ছায়ায়-মায়ায়। দুচোখ ভরে দেখেছেন তিনি প্রাচুর্য। দেখেছেন বাবার দানবৃত্তি। দেখেছেন মানুষের প্রতি তাঁর মমতা ও ভালোবাসা। এসব দেখতে দেখতে নিজের অজান্তে তিনিও হয়ে উঠেছিলেন বাবার মতন .. মায়ের মতন—দানবতী মায়াবতী। না; এ-প্রাচুর্যের ভিড়ে কখনো তিনি অহংকারী হয়ে ওঠেন নি। কেন করবেন অহংকার? সম্পদ ও প্রাচুর্য নিয়ে অহংকার করবেন? নাহ! সে তো শুধুই আল্লাহর দান! সম্পদ নিয়ে অহংকার করা মানুষের সাজে না। যদিও অনেক মানুষ সম্পদ পেলে অন্যের কথা ভুলে যায়। শুধু নিজের কথাই মনে রাখে। গর্ব ও অহংকারে 'গাল ফুলায়'। কিন্তু খাদিজা এ বিশাল প্রাচুর্যের ছায়ায় বসে একটুও অহংকার করেন না, শুধু আল্লাহর শোকর আদায় করেন। আল্লাহ না-দিলে তিনি এবং তাঁর পরিবার কোথায় পেতেন এ-সম্পদ? কোথায় পেতেন এতো সুখ ও আনন্দ?

অসহায় বঞ্চিতদের সহযোগিতায় .. অভাবীদের দুঃখ মোচনে ভীষণ তৃপ্তিবোধ করতেন খাদিজা। তিনি বিশ্বাস করতেন— এ-ই আল্লাহর নেআমতের শোকর! তাই তিনি কাউকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। সবাইকে দিতেন। হাসিমুখে। উদার হাতে। তাঁর মন ছিলো আকাশ-উদার। তাঁর স্বভাব ছিলো মায়ায়-মোড়ানো। অভাবী যখন হাত পাততো, তখন তিনি একটুও বিরক্ত হতেন না। এমন হবেই, তিনিও-যে বাবার গুণাবলি পেয়েছেন! হয়েছেন ঠিক তাঁর অবিকল ছায়া। কী মায়া, কী দয়া! সব সময়, সবার জন্যে!

বাবা খোয়াইলিদ জানেন খাদিজা অনেক গুণী। মেয়ের গুণ দেখে দেখে তাঁর চোখ জুড়ায়, মন জুড়ায়। মেয়ের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা আরও অনেক বেড়ে যায়। মেয়ের অসীম উদারতায় তিনি বারবার মুগ্ধ হন। মেয়ের উন্নত নৈতিকতায় তিনি আপ্লুত হন। মেয়ের জ্বলন্ত মেধা ও বুদ্ধিদীপ্তি তাঁকে স্বপ্ন দেখায়। মেয়ের সংকল্পিক মানসিকতা .. তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভা .. তাঁর প্রখর ধী—তাকে ভীষণ অনুভূত করে।

ব্যবসায়িক বিষয়-আশয় পরিচালনায়ও মেয়ে তাঁর সচেতন এবং সফল। সব মিলিয়ে মেয়ে খাদিজার প্রতি তিনি খুব সন্তুষ্ট। তাঁর কাজে তিনি আনন্দ পান। খাদিজা তাঁর ঘরের শোভা। খাদিজার 'হ্যাঁ' যেমন সুন্দর .. খাদিজার 'না'ও সুন্দর। খাদিজার সবকিছু সুন্দর। সুন্দর মিশে আছে ওর সবকিছুতে। চলায়-বলায়-আচরণে।

বাবা খুওয়াইলিদ ব্যবসার কাজে বাইরে থাকেন অনেক সময়। গৃহে ফিরেই খাদিজার দিকে ভীষণ মনোযোগ দেন তিনি। খাদিজার বিভিন্ন কর্মতৎপরতা লক্ষ করেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চপল-চলা উপভোগ করেন। তাঁর ভালোবাসাকাড়া পদচারণায় 'খুওয়াইলিদ-গৃহ' যেনো জান্নাতের একটি টুকরো হয়ে উঠেছে। খাদিজার দিকে তন্ময়চিত্তে তাকিয়ে বাবা খুওয়াইলিদ ভাবেন—

ওরা কী জালিম, যারা মেয়েদের দেখতে পারে না!

কী নিষ্ঠুর মেয়েদের প্রতি ওদের আচরণ!

কেনো এ নিষ্ঠুরতা? কেনো এ অন্যায়?

ওদের মাঝে কি নেই কোনো 'খাদিজা'?

কী সুন্দর আমার খাদিজা! ও আমার বাড়ির শোভা—প্রস্ফুটিত ফুল!

ও এ পরিবারের গর্ব—আনন্দ!

বাবা খুওয়াইলিদ মেয়েকে অনেক সময় দেন। সুযোগ পেলেই তাঁকে কাছে নিয়ে বসেন। কথা বলেন। মেয়ের সাথে কথা বললে মেয়ে ভীষণ খুশি হন। কিন্তু খুওয়াইলিদদের খুশি যেনো আরও বেশি। খাদিজার চাঁদমুখের দিকে মায়া-মায়া দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করে। তাঁর চপল-চলা, তাঁর চকিত-চাহনি, তাঁর কুদরতি রূপ-লাবণ্য ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব তাঁকে মনে করিয়ে দেয়— আল্লাহর নিপুণ সৃষ্টিশীল কুদরতের কথা। কতো সুন্দর অবয়বে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। খুওয়াইলিদ কথা বলতে বলতে এবং মেয়ের কথা শুনতে শুনতে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

খাদিজা খুব লাজুক মেয়ে। এত কথা হয় ওর সাথে খোয়াইলিদের, তবুও সব কথা বলতে পারেন না। বেশ কিছুদিন ধরে অনেক কুরাইশ যুবক। বিয়ের প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন। এ ব্যাপারে খাদিজাকে কিছুই বলতে পারছেন না। অন্যদিকে খোয়াইদলদের ও কাউকে মনে ধরছে না। খোয়াইলীদের বাড়িতে বনু মাখযুম এর নেতৃত্ব বৃন্দ ভিড় করেছেন। খুব আনন্দঘন পরিবেশে খোয়াইনিদের সাথে আলাপ আলোচনা করছেন। গভীর রাত পর্যন্ত আলাপ আলোচনা চলল এক সময় মজলিস ভাঙলো। বনু মাখযুম প্রসন্ন চিত্তেই বেরিয়ে গেল। খোয়াইলিদ কেও বেশ আনন্দিত দেখাচ্ছিল। তারপর তিনি তার স্ত্রীর

সাথে এই বিষয় নিয়ে পরামর্শ করলেন। স্ত্রী ও সাই দিলো। এমন প্রস্তাবে খাদিজার মা ও খুশি হলেন।

এখন তারা খাদিজার মতামত আছে কি না। বললেন সেটা জানার জন্য খাদিজার সাথে কথা বললেন। খোয়াইলিদ ও তার স্ত্রী ফাতিমা খাদিজাকে আতিক বিন আবিদের ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাইলেন। খাদিজা ভাবলেন হয়তো ব্যবসার বিষয়ে আতিক বিন আবিদ কেমন সেই সম্পকে জানতে চাচ্ছেন। তিনি জবাব দিলেন :

তিনি বন মাখযুম গোত্রের সফল ব্যবসায়ী। কোন পথে লাভ আসে তার ভালোভাবে জানা। তার ব্যবসা ভালোভাবেই চলছে। তার উপার্জন হালাল। আমার বিশ্বাস হালাল পথে এসেছে তার এই খ্যাতি। হারামের ধারে কাছেও তার যাওয়ার কথা না। তাছাড়া তিনি একজন বীরপুরুষ।

খাদিজার এমন জবাব শুনে খোয়াইলিদ ও তার স্ত্রী খুশি হলেন

খোয়াইলিদ বললেন বড় একটি দায়িত্ব তার কাছে আমি অর্পণ করতে যাচ্ছি। আর সেটা ব্যবসা, সম্পদ এর চেয়েও অনেক দামি। খাদিজা কিছু বুঝতে পেরে লজ্জারাঙা হয়ে গেলেন। খোয়াইলিদ কোমল কণ্ঠে খাদিজার ইচ্ছা জানতে চাইলেন।

খাদিজা লজ্জা ভরা মুখ নিয়ে জবাব দিলেন

বাবার মতই আমার মত!

এমন উত্তর ই আশা করেছিলেন খোয়াইলিদ। বিবাহ ঠিক হয়ে গেল। দুই পরিবারই কুরাইশ বংসের বড় বড় গ্রোত্র। অনেক জাঁকজমক ভাবেই বিবাহ হবে। আতিকের পরিবারও তাইই চাইছিল।

খোয়াইলিদ তাই ২ মাস সময় নিলেন তার বড় বড় বাণিজ্য কাফেলা যেন ফিরে আসে। একদিন মক্কার বাণিজ্য-কাফেলা ফিরে এলো। সাথে নিয়ে এলো রঙ-বেরঙের পণ্য। খাদ্য, ফল, সুগন্ধি, পরিধেয় বস্ত্র, নানা রকমের অলঙ্কার। আরও কতো কী! এ কাফেলায় খোয়াইলিদ ও আতিকের উট-বহরও ছিলো। বয়ে-আনা পণ্যের ভেতরে সবচেয়ে দামি ও মূল্যবান পণ্য ছিলো— খাদিজার বিবাহ উপলক্ষে নিয়ে আসা অভিনব সব পাত্র, পোশাক ও বিছানা, পারসিক বিছানা, নানা রকমের সুগন্ধি ও গালিচা, এ-সবই বিবাহ উপলক্ষে খোয়াইলিদদের ফরমায়েশি মালামাল। সব তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন আতিকের বাড়িতে। অপরদিকে আতিকও খাদিজার উপযোগী মহামূল্যবান সামগ্রী এনেছেন। পাঠিয়ে দিয়েছেন খাদিজাদের বাড়িতে।

সারা মক্কা অধীরচিত্তে অপেক্ষা করছিলো আতিক-খাদিজার বন্ধন-রজনী—লাইলাতায় যাফাফের! দরিদ্র ও অসহায়রাও অপেক্ষা করছে এ-কাঙ্ক্ষিত দিনটির। ওদের চিন্তায় কাজ করছে কেবল এ চিন্তা—কয়েকদিন খুব মজা করে খাওয়া যাবে। খাবার-দাবারের একটা আচ্ছা ধুম পড়বে মোটা মোটা উট জবাই হবে। গোশত যেমন খাওয়া যাবে, সাথে করে নিয়েও যাওয়া যাবে। অবাধে। কেউ বাধা দেবে না। এ বাড়ির দরোজ আগে যেমন খোলা ছিলো, এখনো খোলা। এখন আরও বেশি করে খুলে যাবে। মুক্ত অবারিত হয়ে যাবে।

তরুণ-যুবারাও ওই দিনটির জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় সময় কাটাচ্ছে ধরনের অনুষ্ঠানে ওদের মজাটাই তো সবচেয়ে বেশি।একেছেন তিনি মনে মনে

অবশেষে এতো বিবাহের প্রতীক্ষিত সেই দিন। অনুষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত লগ্ন। খোয়াইবিলিদ্-গৃহ পূর্ণ হয়ে গেলো আত্মীয়-স্বজনে। সখী ও বান্ধবীদের ভিড়ে ভরে গেলো। বনু মাখযুমের মহিলারা এলো আতিক -প্রেরিত মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে। এতো কুরাইশ নারীরাও নিজেদের উপহারসামগ্রী নিয়ে। তারপর কতো-যে উঠ জবাই হলো, সারা মক্কার কতো-যে মানুষ খেতে এলো, তার কোনো হিসাব রইলো না।

খাদিজা প্রবেশ করলেন নতুন জীবনে। এ জীবন নিয়ে কত স্বপ্ন একেছে তিনি মনে মনে এ জীবন নিয়ে বাসনা কত আশা তার মনোজগতে ।

স্বামী আতীন বিন আবিদ খাদিজাকে পেয়ে সীমাহীন খুশি। তিনি স্ত্রী হিসেবে যেমনটি চেয়েছিলেন খাদিজা তার চেয়েও অনেক বেশি। স্ত্রী হিসেবে আতিক খাদিজাকে পেয়ে মুগ্ধ এবং তৃপ্ত হয়েছেন। স্বস্তি ও প্রশান্তিতে আপ্লুত হয়েছেন। খাদিজা এবং আতিকের দাম্পত্য জীবন একটি আদর্শ দাম্পত্য জীবনের উদাহরণ।

দেখতে দেখতে খাদিজা ও আতিকের দাম্পত্য জীবন এক বছর পূর্ণ হলো।খাদিজার কোল জুড়ে একটি মেয়ে সন্তান জন্ম নিল। তাদের ঘর আরও মধুময় হলো। মেয়ে দেখতে অনেকটাই খাদিজার মত হয়েছে। আতিক অনেক বেশি খুশি এবং আনন্দিত হলো।

এই খুশি আর বেশি দিন রইলো না। পরের বছর না পেরুতেই আতিক আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে। পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। খাদিজা বিধবা হলেন। আতিকের বিশাল ব্যবসা এবং কোলের ছোট্ট মেয়ে নিয়ে খাদিজা ভীষণ দুঃখে ভেঙে পড়লেন। স্বামীর বিদায়ের পর খাদিজা শোকে পরে রইলেন।

কিছুদিন না যেতেই খাদিজার সৌন্দর্য এবং তার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির লোভে অনেকেই খাদিজাকে বিয়ে করতে চাইলেন। তবে খাদিজার এখন বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। তিনি প্রথম স্বামীর শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। খাদিজার পিতা খোয়াইলিদ খাদিজার কষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি ও চান খাদিজা আবার বিয়ে করুক তার আবার নতুন সংসার হোক।

খোয়াইলিদ উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পেলেন। নাব্বাশ ইবনে যুরারাহ আত তামীমী। এ যেন আতিকেরই প্রতিচ্ছবি। এবার তিনি মেয়ে খাদিজার কাছে গেলেন তাকে বুঝালেন।খাদিজা তো বিয়ে করতে রাজি না । অনেক বুঝিয়ে অবশেষে খাদিজাকে রাজি করাতে পারলেন।আবার খাদিজার বিয়ে হলো নাব্বাশের সাথে। নতুন জীবনে প্রবেশ করলেন আবার খাদিজা। আতিকের মত স্বামীকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান করেন খাদিজা। আসলেই নাব্বাশ আতিকেরই প্রতিচ্ছবি। নাব্বাশ ও খুঁজে পেলেন এক মহীয়সী বধূ। খাদিজাই যেন তার স্বস্তির স্থল, শান্তি লাভের ঠিকানা।

নাব্বাশ ও অনেক ধনী ব্যাবসায়ী। দেশে বিদেশে তার ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নাব্বাশকে পেয়ে খাদিজা আতিককে ভুলেছেন। ভাঙ্গা মনটা জোড়া লেগেছে। নাব্বাশ ও একজন বীরপুরুষ।

নাব্বাশ আর খাদিজার গৃহ সুখ এবং আনন্দেঘেরা। মমতা আর ভালোবাসায় অমন সুখি সংসার মক্কায় চোখে পড়ে না।

মক্কার শ্রেষ্ঠ বাড়ি কোনটা? এককথায় সবার মুখে মুখে নাব্বাশ-খাদিজার বাড়ি।

বছর ঘুরতেই খাজিদার কোল জুড়ে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হলো। নাম রাখলেন - হালা। যার অর্থ চাঁদকে ঘিরে রাখা আলোকবৃত্ত।

আদরে- সোহাগে বেড়ে উঠতে লাগলো হালা। খাদিজার সারা দিন কেটে যায় হালা কে নিয়ে। অনেক সময় দেন আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে। স্বামীর খেদমতেও খাদিজা অদ্বিতীয়া। নাব্বাশকে ডাকা শুরু হলো আবু হালা নামে।

আবু হালার ব্যবসা বাণিজ্য যেন উপচে পরছে। সব দিক থেকে আল্লাহ যেন বরকত ঢেলে দিচ্ছেন এই পরিবারে।

দ্বিতীয় বছরে আবার আরেক পুত্র জন্ম দিলেন খাদিজা। নাম তা 'হিনদ'। আবু হালার খুশি আর ধরে না। আল্লাহর সামনে কৃতজ্ঞতায় মাথা নুইয়ে আসে। কাবা তাওয়াফ করেন। গরীব দুখিদের দাএয়াত করে খাওয়ায়। প্রিজন স্ত্রী খাদিজাকেও আরও বেশি সম্মান -মর্যাদা ও ভালোবাসায় ভরে দিলেন।

এই সুখ খাদিজার আর বেশি দিন সইলো না। আবু হালা কিছু দিন পর আল্লাহর কাছে চলে গেলেন। খাদিজা আবার বিধবা হলেন। এবার আরও বেশি কষ্ট পেলেন খাদিজা পুরোনো শোক ভুলতে না ভুলতেই নতুন শোক। অনেক কাদেন তিনি। দু:খো, বেদনা অশ্রু তে ভিজতে লাগলেন খাদিজা। আতিক- আবু হালার সুখ স্মৃতির আঘাতে শেষ হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

আবু হালার ব্যবসা- বাণিজ্য। ১ মেয়ে ২ ছেলের দিকে খাদিজার নজরই দিচ্ছেন না। । শোকে তিনি দিন দিন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন। খোয়াইলিদ এই সংবাদ পেয়ে দ্রুত চলে আসেন খাদিজার কাছে। মা ফাতিমাও মেয়েকে বুঝচ্ছে। কিন্তু কোনো কিছুই হচ্ছে না। অসুস্থতা দিন দিন বেড়েই চলেছে খাদিজার।

খোয়াইলিদ আনু হালার ব্যবসা বাণিজ্য দেখা শোনা করতে লাগলেন। তার ইয়াতিম নাতি- নাতনিদের সাথে সময় কাটাতেন যেন বাবার চলে যাওয়ার কষ্টটা কিছু কম হয়। আস্তে আস্তে খাদিজা সুস্থ হলেন। শোক কিছুটা কাটিয়ে উঠলেন। এবং আবু হালার রেখে যাওয়া ব্যবসা - বাণিজ্য নিজে তদারকি করা শুরু করলেন। খোয়াইলিদের বয়স হয়েছে নিজের ব্যবধা আছে আবার মেয়ের জামাইয়ের রেখে যাওয়া ব্যবসা একা তদারকি তার জন্য কষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। খাদিজা যখন সব বুঝে নিচ্ছিল খোয়াইলিদ অনেক টা স্বস্তি পেলেন।

কিছু দিন পর খাদিজার পিতা খোয়াইলিদও আল্লাহর ঢাকে সারা দিয়ে চলে গেলেন। খাদিজা আবার শোকে পরে গেলেন স্বামীর শোক কেটে উঠার আগেই পিতা চলে গেলেন দুনিয়া ছেড়ে। এবার খাদিজা একদম একা হয়ে গেলেন।

পিতার শোক কাটিয়ে উঠতে খাদিজার বেশ সময় লাগলেন। তারপর ব্যবসা - বাণিজ্য এর দেখা শোনা করতে লাগলেন এক হাতেই।

খাদিজার সাথে রাসুলের প্রথম দেখা এবং তাদের জীবনি শুরু।

হযরত খাদিজা (রা.) এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রথম পরিচয় ও সাক্ষাৎ ইসলামের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এই পরিচয় কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না, বরং এটি গড়ে উঠেছিল সততা, ব্যবসায়িক দক্ষজা এবং পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে।

১. পটভূমি ও খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসায়িক প্রস্তাব

হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন মক্কার একজন অত্যন্ত ধনাঢ্য, প্রভাবশালী এবং সম্মানিত ব্যবসায়ী নারী। তাঁর পবিত্র চরিত্রের কারণে তাঁকে **'তাহিরা'** (পবিত্রা) বলা হতো। মক্কার তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী, তিনি নিজে ব্যবসা দেখাশোনা করলেও কাফেলা নিয়ে দূর দেশে ভ্রমণের জন্য বিশ্বস্ত পুরুষদের নিয়োগ করতেন এবং লভ্যাংশের একটি অংশ তাদের দিতেন।

অন্যদিকে, তরুণ মুহাম্মদ (সা.) তখন মক্কায় তাঁর অতুলনীয় সততা, আমানতদারিতা এবং সুন্দর চরিত্রের জন্য **'আল-আমিন'** (বিশ্বস্ত) উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.) যখন মুহাম্মদ (সা.)-এর এই সততা ও সুনামের কথা জানতে পারেন, তখন তিনি নিজেই তাঁর কাছে সিরিয়ায় একটি ব্যবসায়িক কাফেলা নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব পাঠান। তিনি মুহাম্মদ (সা.)-কে অন্যান্যদের তুলনায় দ্বিগুণ লভ্যাংশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

২. প্রথম সাক্ষাৎ এবং সিরিয়া সফর

খাদিজা (রা.)-এর এই প্রস্তাবের পর তাঁদের মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ ঘটে। মুহাম্মদ (সা.) তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে পরামর্শ করে এই প্রস্তাবে রাজি হন।

যাত্রার সময় হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত গোলাম **'মাইসারা'**-কে মুহাম্মদ (সা.)-এর সহযোগী হিসেবে সাথে পাঠিয়ে দেন, যাতে সে সফরকালে তাঁর সুযোগ-সুবিধা দেখতে পারে এবং তাঁর আচরণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

৩. সফরে অলৌকিক ও অসাধারণ ঘটনা

সিরিয়া সফরটি ছিল অত্যন্ত সফল। ব্যবসা পরিচালনায় মুহাম্মদ (সা.) অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সততার পরিচয় দেন। পুরো সফরজুড়ে মাইসারা মুহাম্মদ (সা.)-এর কিছু অলৌকিক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন:

- **মেঘের ছায়া:** প্রচণ্ড রোদের মধ্যে যাত্রাপথে মেঘ এসে মুহাম্মদ (সা.)-কে ছায়া দিত।
- **সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎবাণী:** সিরিয়ার কাছাকাছি পৌঁছানোর পর মুহাম্মদ (সা.) একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তখন 'নাস্তুরা' নামক একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসী মাইসারাকে জিজ্ঞেস করেন, "এই গাছের নিচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি কে?"

মাইসারা পরিচয় দিলে সন্ন্যাসী বলেন, *"এই গাছের নিচে নবী ছাড়া আর কেউ কখনো বসেনি। তিনিই শেষ নবী।"*

৪. ফিরে আসা এবং চূড়ান্ত প্রভাব

সিরিয়ার ব্যবসা শেষে মক্কায় ফিরে আসার পর দেখা গেল, অন্যান্য বারের তুলনায় এবার অনেক বেশি মুনাফা অর্জিত হয়েছে। মাইসারা মক্কায় ফিরেই হযরত খাদিজা (রা.)-এর কাছে মুহাম্মদ (সা.)-এর সততা, চমৎকার আচরণ, ন্যায়পরায়ণতা এবং মেঘের ছায়াসহ সন্ন্যাসীর সেই ভবিষ্যৎবাণীর কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

মাইসারার মুখে এই অলৌকিক ও মহৎ গুণের কথা শুনে হযরত খাদিজা (রা.) মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ও মুগ্ধতায় আপ্লুত হন। তিনি বুঝতে পারেন যে, মুহাম্মদ (সা.) কোনো সাধারণ মানুষ নন।

হযরত খাদিজা (রা.) এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিবাহ ইসলামের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ব্যবসায়িক সততা এবং মাইসারার মুখে অলৌকিক ঘটনার বিবরণ শোনার পর, হযরত খাদিজা (রা.)-এর মনে রাসুল (সা.)-এর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তৈরি হয়েছিল, তা-ই পরবর্তীতে এই পবিত্র বন্ধনে রূপ নেয়।

নিচে এই শুভ বিবাহের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

১. বিয়ের প্রস্তাবের সূত্রপাত

আরবের তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী নারীদের পক্ষ থেকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াটা বেশ সংকোচের বিষয় ছিল। তাই হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত বান্ধবী **নাফিসা বিনতে মুনবিহ**-কে মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন।

নাফিসা কৌশলে মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে গিয়ে কথা শুরু করেন। তিনি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে মুহাম্মদ, আপনার বিয়ের বয়স হয়েছে, তবুও আপনি কেন বিয়ে করছেন না?" রাসুল (সা.) উত্তরে বললেন, "বিয়ে করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তো আমার এই মুহূর্তে নেই।"

তখন নাফিসা বললেন, "যদি আপনার এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং আপনাকে এমন এক পাত্রীর সন্ধান দেওয়া হয় যিনি বংশমর্যাদায় অতুলনীয়, ধনাঢ্য, রূপবতী এবং আপনার উপযুক্ত, তবে কি আপনি রাজি হবেন?" রাসুল (সা.) কৌতুহলী হয়ে জানতে চাইলেন, "তিনি কে?" নাফিসা উত্তর দিলেন, "তিনি খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ।"

রাসুল (সা.) কিছুটা বিস্মিত হয়ে বললেন, "তা কেমন করে সম্ভব? তিনি মক্কার এত বড় সম্ভ্রান্ত নারী, আমার মতো সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর বিয়ে কেন হবে?" নাফিসা আশ্বস্ত করে বললেন, "সেই দায়িত্ব আমার।"

২. পারিবারিক আলোচনা ও সম্মতি

নাফিসার কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিষয়টি তাঁর চাচা ও অভিভাবক **আবু তালিব**-এর সাথে আলোচনা করেন। আবু তালিব এই প্রস্তাবে অত্যন্ত আনন্দিত হন। কারণ খাদিজা (রা.)-এর বংশ (বনু আসাদ) এবং রাসুল (সা.)-এর বংশ (বনু হাশেম) উভয়ই ছিল কুরাইশদের অত্যন্ত সম্মানিত শাখা।

এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে উভয় পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের দিন-ক্ষণ চূড়ান্ত করা হয়।

৩. বিয়ের মজলিস ও খুতবা

নির্ধারিত দিনে মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, কুরাইশ বংশের নেতা এবং উভয় পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে বিয়ের মজলিস বসে।

বিয়ের অনুষ্ঠানে বরপক্ষের হয়ে রাসুল (সা.)-এর চাচা **আবু তালিব** একটি ঐতিহাসিক ও আবেগঘন খুতবা (ভাষণ) পাঠ করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন:

"আমার ভাতিজা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ এমন এক যুবক, যার সাথে কুরাইশ বংশের যেকোনো যুবকের তুলনা করা হোক না কেন, সততা, ভদ্রতা, বুদ্ধিমত্তা ও শরাফতের দিক থেকে সে-ই সেরা হবে। যদিও তার ধন-সম্পদ কম, কিন্তু মনে রাখবেন, ধন-সম্পদ তো একটা ক্ষণস্থায়ী ছায়া এবং পরিবর্তনশীল জিনিস। মুহাম্মদ আল্লাহর কসম, ভবিষ্যতে এক মহান মর্যাদার অধিকারী হতে যাচ্ছে।"

কনেপক্ষের হয়ে হযরত খাদিজা (রা.)-এর চাচাতো ভাই এবং তৎকালীন আরবের বিখ্যাত পণ্ডিত **ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল** এই ভাষণের প্রশংসা করেন এবং বিয়ের সম্মতিসূচক বক্তব্য দেন।

৪. মোহরানা এবং দাম্পত্য জীবনের শুরু

এই ঐতিহাসিক বিয়েতে রাসুল (সা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত খাদিজা (রা.)-কে **২০টি উট** (মতান্তরে ৫০০ দিরহাম) মোহরানা হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। বিয়ের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স ছিল **২৫ বছর** এবং হযরত খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল **৪০ বছর** (কোনো কোনো ঐতিহাসিক সূত্রে তাঁর বয়স ২৮ বা ৩৫ বছরও উল্লেখ করা হয়েছে, তবে ৪০ বছরের মতটিই বেশি প্রসিদ্ধ)।

এই বিয়ের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য

- **একনিষ্ঠতা:** হযরত খাদিজা (রা.) যতদিন জীবিত ছিলেন (প্রায় ২৫ বছর), রাসুল (সা.) আর কোনো বিয়ে করেননি।
- **প্রথম ইসলাম গ্রহণ:** নবুয়ত পাওয়ার পর রাসুল (সা.) যখন ভয় পেয়ে হেরা গুহা থেকে ফিরে এসেছিলেন, তখন খাদিজা (রা.)-ই তাঁকে প্রথম সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং পৃথিবীর বুকে প্রথম মানুষ হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।
- **বংশধারা:** রাসুল (সা.)-এর ইব্রাহিম ছাড়া বাকি সব সন্তান (ফাতেমা, জয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, কাসেম ও আব্দুল্লাহ) হযরত খাদিজা (রা.)-এর গর্ভেই জন্ম নেন।

স্ত্রী হিসেবে কেমন ছিলেন খাদিজা:

স্ত্রী হিসেবে হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, পরম আশ্রয় এবং এক আদর্শ জীবনসঙ্গিনী। তাঁদের ২৫ বছরের দাম্পত্য জীবন ছিল পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং ত্যাগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

স্ত্রী হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন, তা নিচে কয়েকটি বিশেষ গুণের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

১. মানসিক প্রশান্তির পরম আশ্রয়

নবুয়ত প্রাপ্তির সেই ঐতিহাসিক ও কঠিন মুহূর্তে হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। হেরা গুহায় প্রথম ওহী বা জিব্রাইল (আ.)-এর আগমনের পর রাসুল (সা.) প্রচণ্ড ভীত ও কম্পিত অবস্থায় ঘরে ফিরে আসেন এবং বলেন, *"আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।"*

তখন খাদিজা (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে যে ঐতিহাসিক কথাগুলো বলেছিলেন, তা একজন আদর্শ স্ত্রীর মানসিক শক্তির পরিচয় দেয়। তিনি বলেছিলেন:

"কখনো নয়! আল্লাহর কসম, তিনি আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, অসহায়-দরিদ্রদের সাহায্য করেন, মেহমানদারী করেন এবং বিপন্ন মানুষকে সহযোগিতা করেন।"

২. প্রথম বিশ্বাসী ও নিঃশর্ত সমর্থন

যখন মক্কার সবাই রাসুল (সা.)-কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছিল, তখন খাদিজা (রা.) বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তাঁর ওপর ঈমান আনেন। তিনি ছিলেন ইসলামের

ইতিহাসের প্রথম মুসলমান। রাসুল (সা.)-এর নবুয়তের মিশনের ওপর তাঁর এই অটুট বিশ্বাস রাসুল (সা.)-কে দাওয়াতের কাজে অনেক বড় মানসিক শক্তি জুগিয়েছিল।

৩. সমস্ত সম্পদ ইসলামের পথে উৎসর্গ

বিয়ের আগে হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন মক্কার অন্যতম শীর্ষ ধনী। কিন্তু বিয়ের পর এবং বিশেষ করে ইসলাম প্রচারের সূচনা লগ্নে, তিনি তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ রাসুল (সা.)-এর চরণে সমর্পণ করেন। মক্কার কাফেররা যখন রাসুল (সা.) ও তাঁর বংশকে 'শিয়াবে আবু তালিব' নামক গিরিপথে তিন বছর বয়কট করে বন্দি করে রেখেছিল, তখন খাদিজা (রা.) নিজের সব সম্পদ দিয়ে বন্দি মুসলমানদের খাদ্যের জোগান দিয়েছিলেন এবং নিজেও চরম ক্ষুধা ও কষ্ট সহ্য করেছিলেন।

৪. ঘর ও সংসারের চমৎকার ব্যবস্থাপনা

ব্যবসায়ী নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঘরোয়া পরিমণ্ডলে ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। রাসুল (সা.) যখন হেরা গুহায় দিনরাত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন, তখন খাদিজা (রা.) নিজে হেঁটে পাহাড়ে উঠে রাসুল (সা.)-এর জন্য খাবার পৌঁছে দিতেন। সন্তানদের লালন-পালন এবং রাসুল (সা.)-এর আরাম-আয়েশের দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল।

খাদিজা (রা.)-এর প্রতি রাসুল (সা.)-এর ভালোবাসা ও মূল্যায়ন

হযরত খাদিজা (রা.) স্ত্রী হিসেবে কতখানি অসাধারণ ছিলেন, তা রাসুল (সা.)-এর নিজের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়। তাঁর মৃত্যুর পরও রাসুল (সা.) প্রায়ই তাঁর প্রশংসা করতেন। একদিন রাসুল (সা.)-এর অন্যতমা স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.) ঈর্ষাবশত বলেই ফেললেন, "আপনি মক্কার এক বৃদ্ধার কথা এত কেন স্মরণ করেন, যার দাঁত পড়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তো আপনাকে তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেছেন?"

উত্তরে রাসুল (সা.) আবেগাপ্লুত হয়ে বলেছিলেন:

"আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম কোনো স্ত্রী দান করেননি। মানুষ যখন আমাকে অস্বীকার করেছিল, তখন সে আমার ওপর ঈমান এনেছিল। মানুষ যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তখন সে আমাকে সত্যবাদী বলে সাক্ষ্য দিয়েছিল। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করেছিল, তখন সে তার সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিল। আর আল্লাহ তাঁর মাধ্যমেই আমাকে সন্তানাদি দান করেছেন।"

এমনকি মহান আল্লাহ তাআলা স্বয়ং জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত খাদিজা (রা.)-কে সালাম পাঠিয়েছিলেন এবং বেহেশতে তাঁর জন্য মুক্তা দিয়ে তৈরি একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্ত্রী হিসেবে হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন ত্যাগ, বিশ্বস্ততা, ভালোবাসা এবং সাহসিকতার এক মূর্ত প্রতীক।

বাবা- মা হিসেবে কেমন ছিলেন তারা:

মা ও বাবা হিসেবে হযরত খাদিজা (রা.) এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত স্নেহময়, দায়িত্বশীল এবং অনুকরণীয়। তৎকালীন আরবে যখন কন্যাসন্তানদের অবহেলা করা হতো, এমনকি জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, সেই অন্ধকার যুগে এই পবিত্র দম্পতি তাঁদের সন্তানদের (বিশেষ করে কন্যাদের) যেভাবে লালন-পালন করেছিলেন, তা আজ বিশ্ববাসীর জন্য এক পরম আদর্শ।

পিতা-মাতা হিসেবে তাঁদের এই সুন্দর রূপটি নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. কন্যাসন্তানদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও সম্মান

হযরত খাদিজা (রা.)-এর গর্ভে রাসুল (সা.)-এর চার কন্যা—জয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতিমা (রা.) জন্ম নেন। তৎকালীন আরবের কুপ্রথার বিপরীতে দাঁড়িয়ে এই দম্পতি তাঁদের কন্যাদের রাজকীয় স্নেহে বড় করেন।

- **রাসুল (সা.)-এর স্নেহ:** রাসুল (সা.) তাঁর কন্যাদের এতটাই ভালোবাসতেন যে, কনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) যখনই তাঁর সামনে আসতেন, রাসুল (সা.) নিজে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতেন, তাঁর কপালে চুমু খেতেন এবং নিজের বসার জায়গায় তাঁকে বসাতেন।
- **খাদিজা (রা.)-এর মাতৃত্ব:** একজন ব্যস্ত ও ধনী ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও খাদিজা (রা.) সন্তানদের লালন-পালনে কোনো কমতি রাখেননি। তিনি কন্যাদের ঘরের কাজ, শালীনতা, ধৈর্য ও উচ্চ নৈতিকতার শিক্ষা নিজে হাতে দিয়েছিলেন।

২. শোক ও সংকটে অটল ধৈর্য

পিতা-মাতা হিসেবে তাঁদের জীবন কেবল আনন্দের ছিল না, বরং ছিল চরম পরীক্ষার। শৈশবেই তাঁদের দুই পুত্র সন্তান—কাসেম এবং আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন।

- মক্কার কাফেররা যখন পুত্র সন্তানদের মৃত্যুর পর রাসুল (সা.)-কে 'আবতার' বা 'নিবংশ' বলে উপহাস করত, তখন মা হিসেবে খাদিজা (রা.) এবং বাবা হিসেবে রাসুল (সা.) চরম ধৈর্য ধারণ করেন।
- তাঁরা একে অপরের হাত ধরে এই কঠিন মানসিক ধাক্কা সামলে নেন এবং আল্লাহর ফয়সালের ওপর সন্তুষ্ট থাকেন।

৩. সন্তানদের আদর্শ বিয়ে ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠন

সন্তানদের বিয়ের ক্ষেত্রে এই দম্পতি অত্যন্ত চমৎকার ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

- তাঁদের বড় মেয়ে হযরত জয়নব (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিল খাদিজা (রা.)-এর বোনের ছেলে আবুল আস ইবনে রাবির সাথে। বিয়ের সময় খাদিজা (রা.) তাঁর নিজের একটি দামি ইয়েমেনি হাড় মেয়েকে উপহার দিয়েছিলেন (যা পরবর্তীতে জয়নবের প্রতি তাঁর মায়ের গভীর ভালোবাসার প্রতীক হয়ে উঠেছিল)।
- অন্য দুই মেয়ে রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে তাঁরা অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান ও লজ্জিত পুরুষ হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে (একজনের মৃত্যুর পর অন্যজনকে) বিয়ে দেন।

৪. প্রতিকূল পরিবেশেও সন্তানদের পাশে থাকা

ইসলামের শুরুর দিকে যখন মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার নেমে আসে, তখন এই পিতা-মাতা নিজেদের সন্তানদের আগলে রেখেছিলেন।

- কাফেরদের অত্যাচারের কারণে যখন রুকাইয়া (রা.) ও তাঁর স্বামী উসমান (রা.) হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করেন, তখন বাবা-মা হিসেবে রাসুল (সা.) ও খাদিজা (রা.) তাঁদের জন্য সবসময় উদ্বিগ্ন থাকতেন এবং দোয়া করতেন।
- 'শিয়াবে আবু তালিব' গিরিপথে তিন বছর যখন তাঁরা অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন নিজেদের ক্ষুধা ও কষ্টের চেয়ে সন্তানদের ক্ষুধার কষ্ট তাঁদের বেশি পীড়িত করত। খাদিজা (রা.) নিজের সব সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে সন্তানদের ও মুসলমানদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

৫. ঘরের পরিবেশ ছিল শান্তিময় ও সংস্কারমুক্ত

তাঁদের ঘরের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত শান্ত, যেখানে কোনো চিৎকার-চেঁচামেচি বা অশান্তি ছিল না। রাসুল (সা.) সন্তানদের সাথে হাসিখুশি থাকতেন, খেলতেন এবং তাঁদের চমৎকার আদব-কায়দা শেখাতেন। মা খাদিজা (রা.) সন্তানদের এমনভাবে তৈরি

করেছিলেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই পরবর্তী জীবনে ইসলামের ইতিহাসে এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠেছিলেন।

সংক্ষেপে: মা-বাবা হিসেবে খাদিজা (রা.) এবং মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এক সুসংগত দল। খাদিজা (রা.)-এর মমতা ও রাসুল (সা.)-এর আদর্শিক শিক্ষা মিলে তাঁদের ঘরটি ছিল পৃথিবীর বুকে এক টুকরো জান্নাত। তাঁরা প্রমাণ করে গেছেন যে, সন্তানদের কেবল অর্থ-সম্পদ নয়, বরং সঠিক দ্বীনি শিক্ষা, ভালোবাসা এবং সময় দেওয়াই পিতা-মাতার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

নবুওত প্রাপ্তি :

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময় অধ্যায়। নিচে এই অলৌকিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাটি সহজভাবে বর্ণনা করা হলো:

পটভূমি ও হেরা গুহায় ধ্যান

নবুয়ত লাভের পূর্বে আরবের সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় দেখে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানসিকভাবে ভীষণ ব্যথিত হতেন। তিনি মক্কার কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে সত্য ও সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

মক্কা নগরী থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত **জাবালে নূর** (আলোর পাহাড়) পর্বতের চূড়ায় **হেরা গুহায়** তিনি দীর্ঘ সময় ধরে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে যায় এবং কখনো কখনো তিনি টানা কয়েকদিন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন।

ওহী বা নবুয়ত প্রাপ্তির মূল ঘটনা

৬১০ খ্রিস্টাব্দের রমজান মাসের এক রাতে (যা পরবর্তীতে লাইলাতুল কদর বা কদরের রাত হিসেবে পরিচিত), যখন তাঁর বয়স হয়েছিল **৪০ বছর**, তখন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে।

১. **ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন:** ধ্যানরত অবস্থায় হঠাৎ আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর সামনে উপস্থিত হন।

২. **প্রথম বাণী পাঠের নির্দেশ:** জিবরাঈল (আ.) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, *"ইকরা"* অর্থাৎ **"পড়ুন"**।

৩. **রাসূল (সা.)-এর উত্তর:** আল্লাহর রাসূল (সা.) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উত্তর দিলেন, *"মা আনা বি-ক্বারী"* অর্থাৎ **"আমি তো পড়তে জানি না"**।

৪. **আলিঙ্গন ও চাপ প্রয়োগ:** তখন ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে শক্তভাবে চাপ দেন এবং ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বলেন, "পড়ুন"। এভাবে তিনবার চাপ দেওয়ার পর রাসূল (সা.)-এর হৃদয়ে ওহীর বাণী স্থায়ী রূপ নেয়।

এরপর জিবরাঈল (আ.) পবিত্র কুরআনের **সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত** তিলাওয়াত করেন, যা ছিল মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রথম ওহী:

"পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন, আর আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।"

ঘটনা পরবর্তী অবস্থা ও হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভূমিকা

ওহী লাভের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তীব্র ভয় ও কম্পন অনুভব করেন। আল্লাহর বাণীর এই বিশাল ও গম্ভীর বোঝা এবং এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় তাঁর শরীর কাঁপতে থাকে।

- **বাড়ি প্রত্যাবর্তন:** তিনি হেরা গুহা থেকে দ্রুত মক্কায় নিজের ঘরে ফিরে আসেন এবং অত্যন্ত ভীত ও কম্পিত কণ্ঠে তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)-কে বলেন, *"যাম্মিলুনী, যাম্মিলুনী"* অর্থাৎ **"আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।"**
- **খাদিজা (রা.)-এর সান্ত্বনা:** হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে কম্বল জড়িয়ে দেন এবং তাঁর ভীতি দূর করার জন্য পরম মমতায় সান্ত্বনা দিয়ে বলেন:

"কখনো নয়! আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায়-দরিদ্রদের সাহায্য করেন, অতিথিদের সেবা করেন এবং সত্যের পক্ষে বিপদে মানুষকে সহযোগিতা করেন।"

ওরাকা বিন নওফলের নিকট গমন ও নবুয়তের স্বীকৃতি

হযরত খাদিজা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই **ওরাকা বিন নওফলের** কাছে যান। ওরাকা ছিলেন একজন অন্ধ বৃদ্ধ এবং হিব্রু ভাষার পন্ডিত, যিনি তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন।

সব ঘটনা শোনার পর ওরাকা বিন নওফল অত্যন্ত আবেগ আপ্লুত হয়ে বলেন:

"ইনি তো সেই 'নামুস' (পবিত্র ফেরেশতা জিবরাঈল), যাঁকে আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম, যেদিন আপনার কওম (জাতি) আপনাকে এ দেশ থেকে বের করে দেবে!"

রাসূল (সা.) অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, *"তারা কি আমাকে বের করে দেবে?"* ওরাকা উত্তর দিলেন, *"হ্যাঁ, আপনি যে বাণী নিয়ে এসেছেন, তা যখনই কেউ নিয়ে এসেছে, দুনিয়াবাসী তার শত্রুতা করেছে।"*

এই ঘটনার মাধ্যমেই আনুষ্ঠানিকভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বনবী ও আল্লাহর শেষ রাসূল হিসেবে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং পৃথিবীতে ইসলামের আলো ছড়াতে শুরু করেন।

শিয়াবে আবু তালিব

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত জীবনের সবচেয়ে কঠিন এবং হৃদয়বিদারক দুটি অধ্যায় হলো **শিয়াবে আবু তালিবের বন্দিদশা**

১. শিয়াবে আবু তালিবে বন্দিদশা (সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট)

মক্কায় যখন ইসলামের দাওয়াত দিন দিন ছড়িয়ে পড়ছিল এবং বড় বড় কুরাইশ নেতারা ইসলাম গ্রহণ করছিলেন, তখন কাফেররা মুসলমানদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য এক নিষ্ঠুর পরিকল্পনা করে। তারা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব গোত্রকে (যারা রাসূল সা.-কে রক্ষা করছিল) সামাজিকভাবে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়।

- **বয়কটের চুক্তি:** নবুয়তের ৭ম বছরে (৬১৭ খ্রিস্টাব্দে) কুরাইশরা একটি চুক্তিপত্র লেখে এবং তা কাবার দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেয়। চুক্তির শর্ত ছিল: কেউ মুসলমানদের সাথে কোনো লেনদেন করবে না, তাদের কাছে খাবার বিক্রি করবে না এবং তাদের সাথে কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক রাখবে না।
- **উপত্যকায় আশ্রয়:** এই কঠিন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আবু তালিব তাঁর গোত্রের সমস্ত মানুষকে নিয়ে মক্কার একটি সংকীর্ণ পাহাড়ি উপত্যকা **"শিয়াবে আবু তালিব"**-এ আশ্রয় নেন।
- **৩ বছরের চরম কষ্ট:** এই বন্দিদশা দীর্ঘ **৩ বছর** (নবুয়তের ৭ম থেকে ১০ম বছর পর্যন্ত) স্থায়ী হয়েছিল। কাফেররা উপত্যকায় কোনো খাবার পৌঁছাতে দিত

না। ক্ষুধার তীব্রতায় মুসলমানরা, বিশেষ করে অবুজ শিশুরা যন্ত্রণায় চিৎকার করত, যার আওয়াজ উপত্যকার বাইরে থেকেও শোনা যেত। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সাহাবিরা গাছের পাতা এবং শুকনো চামড়া পানিতে ভিজিয়ে চিবিয়ে খেয়ে দিন পার করেছেন।

- **চুক্তি অবসান:** অবশেষে নবুয়তের ১০ম বছরে আল্লাহর অলৌকিক কুদরতে কাবার দেওয়ালে ঝুলানো চুক্তিপত্রটি উইপোকা খেয়ে ফেলে (শুধু 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' অংশটি ছাড়া)। এই অলৌকিক ঘটনা এবং মক্কার কয়েকজন দয়ালু নেতার হস্তক্ষেপে ৩ বছর পর এই নিষ্ঠুর বয়কটের অবসান ঘটে।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর ওফাত (মৃত্যু)

হযরত খাদিজা (রা.)-এর ওফাত বা মৃত্যু ইসলামের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। নবুয়তের ১০ম বছরে (৬২০ খ্রিস্টাব্দে) রমজান মাসে ৬৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তাঁর মৃত্যুর ঘটনা এবং এর পরবর্তী পরিস্থিতি নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

মৃত্যুর পটভূমি ও কারণ

মক্কার কাফেরদের দ্বারা সুদীর্ঘ **৩ বছর শিয়াবে আবু তালিব** উপত্যকায় অবরুদ্ধ থাকার সময় মুসলমানদের ওপর চরম খাদ্যসংকট ও অমানুষিক নির্যাতন নেমে এসেছিল। গাছের পাতা ও শুকনো চামড়া খেয়ে মুসলমানদের দিন কাটাতে হয়েছিল।

হযরত খাদিজা (রা.) মক্কার সবচেয়ে ধনী নারী হওয়া সত্ত্বেও এই বয়কট বা বন্দিদশার দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে উপত্যকায় অবস্থান করেন এবং সমস্ত কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নেন। এই দীর্ঘ ৩ বছরের অনাহার, মানসিক চাপ এবং চরম কষ্টের কারণে তাঁর স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়ে। উপত্যকা থেকে মুক্তি পাওয়ার মাত্র কয়েক মাসের মাথায় তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শয্যাশায়ী হন।

শেষ মুহূর্ত ও রাসূল (সা.)-এর সান্ত্বনা

মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় হযরত খাদিজা (রা.) ইসলামের ভবিষ্যৎ এবং তাঁর ছোট ছোট সন্তানদের (বিশেষ করে হযরত ফাতিমা রা.) কথা চিন্তা করে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর পাশে বসেন এবং পরম মমতায় তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন:

"আল্লাহ তাআলা বেহেশতে আপনার জন্য এমন একটি মুক্তার তৈরি প্রাসাদের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যেখানে কোনো শোরগোল বা ক্লান্তি থাকবে না।"

রাসূল (সা.) তাঁকে আরও আশ্বস্ত করেন যে, আল্লাহর দরবারে তাঁর ত্যাগ ও কুরবানি সম্পূর্ণ কবুল হয়েছে এবং তিনি জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীদের একজন।

দাফন ও জানাজা

হযরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁকে মক্কার বিখ্যাত **"জান্নাতুল মুয়াল্লা"** কবরস্থানে দাফন করা হয়।

- **কবরে নামা:** রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে অত্যন্ত শোকাকুল হৃদয়ে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর কবরে নেমেছিলেন এবং তাঁকে নিজ হাতে কবরে শায়িত করেছিলেন।
- **জানাজার নামাজ:** তখনো পর্যন্ত ইসলামে জানাজার নামাজ পড়ার বিধান বা নিয়ম অবতীর্ণ হয়নি। তাই তাঁর জানাজার নামাজ পড়া হয়নি, সরাসরি দাফন সম্পন্ন করা হয়েছিল।

রাসূল (সা.)-এর জীবনে এর প্রভাব

হযরত খাদিজা (রা.)-এর বিদায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে এক অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি করেছিল। তিনি ছিলেন রাসূল (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী, প্রথম মুসলিম এবং তাঁর সবচেয়ে কঠিন সময়ের পরম সুহৃদ।

- এর মাত্র কয়েকদিন আগেই রাসূল (সা.) তাঁর অভিভাবক ও চাচা আবু তালিবকে হারিয়েছিলেন। ঘরের ভেতরের শান্তিদাতা (খাদিজা) এবং বাইরের রক্ষাকর্তা (আবু তালিব)—উভয়কে একসাথে হারিয়ে রাসূল (সা.) গভীরভাবে শোকাহত হন। এই কারণে ইসলামের ইতিহাসে এই বছরটিকে **"আমুল হুজন"** বা **"দুঃখের বছর"** হিসেবে অভিহিত করা হয়।

খাদিজার ওফাতের পর রাসুল (সা.)

হযরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন এক চরম সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর সেই সময়ের অবস্থাকে সাহাবিরা গভীর বেদনা ও উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছিলেন।

খাদিজা (রা.)-এর ওফাতের পর রাসূল (সা.)-এর অবস্থা কেমন ছিল, তা কয়েকটি দিক থেকে অনুধাবন করা যায়:

১. গভীর মানসিক শোক ও নিঃসঙ্গতা

হযরত খাদিজা (রা.) কেবল রাসূল (সা.)-এর স্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার আশ্রয়। নবুয়তের কঠিন দিনগুলোতে ঘরে ফিরলে খাদিজা (রা.) সমস্ত ক্লান্তি ও দুঃখ ভুলিয়ে দিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাসূল (সা.) ঘরের ভেতর সম্পূর্ণ একা ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। তাঁর মুখে দীর্ঘ সময় ধরে হাসির রেখা দেখা যায়নি। তিনি প্রায়ই বিষণ্ণ থাকতেন এবং খাদিজা (রা.)-এর স্মৃতি মনে করে নীরবে অশ্রুপাত করতেন।

২. কাফেরদের অত্যাচারের তীব্রতা বৃদ্ধি

একদিকে ঘরের ভেতর খাদিজা (রা.)-এর বিদায়, অন্যদিকে এর মাত্র কয়েকদিন আগেই বাইরের রক্ষাকর্তা চাচা আবু তালিবের মৃত্যু। এই দুজনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মক্কার কুরাইশরা রাসূল (সা.)-এর ওপর অত্যাচারের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। আবু তালিব বেঁচে থাকতে যা করার সাহস তারা পায়নি, এখন তা-ই করতে শুরু করল। রাস্তায় চলার সময় রাসূল (সা.)-এর মাথায় ধুলোবালি ও ময়লা ছুঁড়ে দেওয়া হতো, এমনকি কাবার চত্বরে সিজদারত অবস্থায় তাঁর পিঠে উটের ওঝড়ি (নাড়িভুঁড়ি) চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

৩. মাতৃহীন সন্তানদের নিয়ে উদ্বেগ

খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁদের ছোট ছোট সন্তানদের, বিশেষ করে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর লালন-পালন ও দেখাশোনার পুরো দায়িত্ব রাসূল (সা.)-এর ওপর আসে। মা হারিয়ে সন্তানরা কাঁদত, আর উম্মতের চিন্তার পাশাপাশি মাতৃহীন সন্তানদের এই কষ্ট রাসূল (সা.)-কে গভীরভাবে ব্যথিত করত। তাঁর এই নিঃসঙ্গতা ও ঘরের কষ্ট দেখে পরবর্তীতে সাহাবিদের অনুরোধে তিনি হযরত সাওদা (রা.)-কে বিয়ে করেন, যাতে তিনি সন্তানদের দেখাশোনা করতে পারেন।

৪. তায়েফের ময়দানে গমন

মক্কায় যখন কাফেরদের অত্যাচার অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং ইসলামের দাওয়াতের পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন রাসূল (সা.) মানসিক ক্ষত ও দুঃখ নিয়ে মক্কার বাইরে আশ্রয়ের খোঁজে এবং দ্বীনের দাওয়াত দিতে **তায়েফ** যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানেও তাঁকে নির্মমভাবে পাথর মেরে রক্তাক্ত করা হয়। এটি ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম কঠিন পরীক্ষা।

আজীবন খাদিজা (রা.)-কে স্মরণ

রাসূল (সা.) তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খাদিজা (রা.)-এর ভালোবাসার কথা ভুলতে পারেননি। পরবর্তী জীবনেও যখনই তাঁর কথা উঠত, রাসূল (সা.) বলতেন:

"আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে খাদিজার চেয়ে উত্তম কোনো স্ত্রী দান করেননি। যখন মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তখন সে আমাকে বিশ্বাস করেছিল। যখন মানুষ আমাকে বঞ্চিত করেছিল, তখন সে তার সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিল।"

এমনকি ঘরে কোনো পশু জবাই হলে রাসূল (সা.) পরম মমতায় খাদিজা (রা.)-এর বান্ধবীদের খুঁজে খুঁজে তাদের বাড়িতে উপহার পাঠাতেন। প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা ও শোক চিরকাল অনন্য হয়ে থাকবে।

হযরত সাওদা বিনতে জামআ (রা.)

রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত সাওদা বিনতে জামআ (রা.)-এর বিবাহ ইসলামের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। নবুয়তের দশম বছরে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর এটি ছিল আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর দ্বিতীয় বিবাহ।

নিচে এই বিবাহের বিস্তারিত পটভূমি ও বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. বিবাহের পটভূমি

হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর আল্লাহর রাসূল (সা.) গভীরভাবে শোকাহত হয়ে পড়েন। একদিকে প্রিয়তমা স্ত্রীর বিদায়, অন্যদিকে চাচা আবু তালিবের মৃত্যু—সব মিলিয়ে এই বছরটিকে ইতিহাসে **"আমুল হুজন"** বা "শোকের বছর" বলা হয়।

খাদিজা (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে রাসুল (সা.)-এর ঘর গোছানো, সন্তানদের দেখাশোনা করা এবং মক্কার কাফেরদের চরম নির্যাতনের মুখে ঘরে-বাইরে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। রাসুল (সা.)-এর এই নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতা দেখে তাঁর ফুফু এবং হযরত উসমান ইবনে মাজউন (রা.)-এর স্ত্রী **খাওলা বিনতে হাকিম (রা.)** রাসুল (সা.)-কে পুনরায় বিবাহের পরামর্শ দেন। তিনি কুমারী মেয়ে হিসেবে হযরত আয়েশা (রা.) এবং বয়স্কা ও বিধবা হিসেবে হযরত সাওদা (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেন। রাসুল (সা.)

ঘরের পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রথমে সাওদা (রা.)-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন।

২. হযরত সাওদা (রা.)-এর পরিচয় ও ত্যাগ

হযরত সাওদা (রা.) ছিলেন কুরাইশ বংশের আমের ইবনে লুআই শাখার সন্তান। তিনি এবং তাঁর প্রথম স্বামী সাকরান ইবনে আমর (রা.) ইসলামের একদম শুরুর দিকেই মুসলিম হয়েছিলেন। কাফেরদের নির্যাতন থেকে বাঁচতে তাঁরা দুজনেই দ্বিতীয়বার হাবশায় (আবিসিনিয়া) হিজরত করেছিলেন।

হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসার পর তাঁর স্বামী সাকরান ইবনে আমর (রা.) ইন্তেকাল করেন। ফলে সাওদা (রা.) সম্পূর্ণ একা ও অসহায় হয়ে পড়েন। মক্কায় তাঁর কাফের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য চাপ দিতে পারত—এমন এক চরম সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন।

৩. বিবাহের প্রস্তাব ও সম্মতি

রাসুল (সা.)-এর অনুমতি পেয়ে খাওলা বিনতে হাকিম (রা.) হযরত সাওদা (রা.)-এর কাছে যান। খাওলা গিয়ে বললেন, "হে সাওদা! আল্লাহ তোমার ঘরে যে কল্যাণ ও বরকত পাঠিয়েছেন, তা কি তুমি জানো?" সাওদা (রা.) বিস্ময় প্রকাশ করলে খাওলা জানান যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন।

সাওদা (রা.) অত্যন্ত আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করেন, তবে তিনি বিনয়ের সাথে বলেন, "আমি তো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যোগ্য নই, তবে আপনি আমার বাবার সাথে কথা বলতে পারেন।" (তখনও তাঁর বৃদ্ধ বাবা ইসলাম গ্রহণ করেননি)। খাওলা (রা.) তাঁর বাবা জামআ ইবনে কায়েসের কাছে গিয়ে প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে তিনি বলেন, "মোহাম্মদ (সা.) তো এক সম্মানিত ও অভিজাত ব্যক্তি। কিন্তু সাওদা কী বলে?" খাওলা জানান যে, সাওদা রাজী আছেন। এরপর সাওদার পিতা এই বিয়েতে সম্মতি দেন।

৪. বিবাহ সম্পন্ন হওয়া

মক্কাতেই এই ঐতিহাসিক বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় হযরত সাওদা (রা.)-এর বয়স ছিল প্রায় ৫০ বছর (মতান্তরে কিছুটা কম বা বেশি)। রাসুল (সা.) তাঁকে **৪০০ দিরহাম** মোহরানা প্রদান করেছিলেন।

তখনও হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে রাসুল (সা.)-এর কেবল আকদ (বিয়ে) হয়েছিল, কিন্তু অল্প বয়সের কারণে বিদায় (রুখসতী) হয়নি। তাই বিয়ের পর সাওদা

(রা.)-ই রাসুল (সা.)-এর ঘরে আসেন এবং প্রায় তিন বছর যাবত তিনিই ছিলেন রাসুল (সা.)-এর একমাত্র স্ত্রী।

৫. বৈবাহিক জীবন ও তাঁর মহানুভবতা

হযরত সাওদা (রা.) রাসুল (সা.)-এর ঘরে আসার পর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ঘরকন্নার কাজ এবং রাসুল (সা.)-এর সন্তানদের (বিশেষ করে হযরত ফাতিমা রা.-এর) মাতৃস্নেহে লালন-পালন করতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল, সরলমনা এবং রসিক স্বভাবের মানুষ ছিলেন।

বয়স যখন অনেক বেড়ে যায়, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে রাসুল (সা.) তরুণী স্ত্রীদের (যেমন হযরত আয়েশা রা.) প্রতি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। তখন তিনি কেবল রাসুল (সা.)-এর স্ত্রী হিসেবে পরকালে পুনরুত্থিত হওয়ার সৌভাগ্য ধরে রাখার জন্য নিজের ভাগের রাতটি হযরত আয়েশা (রা.)-কে স্বেচ্ছায় উপহার দেন। তিনি বলেছিলেন:

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার দিনটি আয়েশাকে দিয়ে দিলাম। আমার কোনো জাগতিক চাওয়া নেই, আমি শুধু কিয়ামতের দিন আপনার স্ত্রী হিসেবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে চাই।"

বিবাহের মূল শিক্ষা ও তাৎপর্য

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই বিবাহটি কোনো কামনাবাসনা বা সৌন্দর্যের কারণে ছিল না। এটি ছিল একজন মহান ও ত্যাগী মুসলিম নারীর প্রতি **সহমর্মিতা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দ্বীনি দায়িত্বের** অংশ। এর মাধ্যমে রাসুল (সা.) প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামের জন্য ঘরবাড়ি ও আত্মীয়স্বজন ত্যাগকারী বিধবা নারীদের সম্মান ও আশ্রয় দেওয়া ইসলামী সমাজের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

স্ত্রী হিসেবে সাওদা কেমন ছিলেন :

হযরত সাওদা বিনতে জামআ (রা.) স্ত্রী হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত চমৎকার, দায়িত্বশীল, এবং মহানুভব গুণের অধিকারী। উম্মুল মুমিনীনদের (রাসূল সা.-এর স্ত্রীদের) মধ্যে তাঁর স্থান ছিল অনন্য।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাঁর বৈবাহিক জীবনের দিকে তাকালে স্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. সন্তানদের প্রতি মাতৃস্নেহ ও ঘর গোছানো

হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর রাসূল (সা.)-এর ছোট ছোট সন্তানরা মাতৃহীন হয়ে পড়েছিলেন। সাওদা (রা.) ঘরে আসার পর মায়ের শূন্যতা সম্পূর্ণ দূর করেন। তিনি অত্যন্ত যত্ন ও ভালোবাসার সাথে রাসূল (সা.)-এর সন্তানদের দেখাশোনা করেন এবং ঘরকন্নার পুরো দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। তাঁর এই সেবা রাসূল (সা.)-কে মানসিকভাবে অনেক স্বস্তি দিয়েছিল।

২. গভীর আনুগত্য ও ভালোবাসা

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। রাসূল (সা.)-এর প্রতি তাঁর সম্মান ও আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। বিদায় হজের সময় রাসূল (সা.) তাঁর স্ত্রীদের বলেছিলেন, "এই হজের পর তোমরা ঘরে অবস্থান করবে (অযথা বাইরে যাবে না)।" রাসূল (সা.)-এর এই বাণী সাওদা (রা.) এত কঠোরভাবে মেনে চলতেন যে, নফল হজ বা ওমরাহর জন্যও তিনি আর কখনো মক্কা বা মদিনার বাইরে যাননি। তিনি বলতেন, "আল্লাহর কসম! রাসূল (সা.)-এর পর আমি আর কোনো বাহনে চড়ব না।"

৩. উদারতা ও অতুলনীয় কোরবানি (আত্মত্যাগ)

স্ত্রী হিসেবে সাওদা (রা.)-এর জীবনের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত ছিল তাঁর আত্মত্যাগ। বয়স বেড়ে যাওয়ার পর তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) হয়তো তাঁর প্রতি বৈবাহিক আকর্ষণ কিছুটা হারিয়ে ফেলছেন এবং তরুণী স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে সময় কাটাতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন, তখন তিনি এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে গিয়ে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার ভাগের দিন ও রাতটি আয়েশাকে দিয়ে দিলাম।" তিনি শুধু রাসূল (সা.)-এর স্ত্রী হিসেবে দুনিয়া ও আখিরাতে থাকার মর্যাদাটুকু চেয়েছিলেন, কোনো জাগতিক অধিকার দাবি করেননি। তাঁর এই মহানুভবতায় রাসূল (সা.) অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন।

৪. রসিক ও প্রফুল্ল স্বভাব

গম্ভীর ও বয়স্ক হলেও সাওদা (রা.)-এর স্বভাব ছিল বেশ প্রফুল্ল। তিনি মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে এমন কিছু কৌতুক বা মজার কথা বলতেন, যা শুনে রাসূল (সা.) হেসে ফেলতেন।

- *একটি বর্ণনা অনুসারে:* একবার তিনি রাসূল (সা.)-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে আমি আপনার পেছনে নামাজ পড়েছিলাম। আপনি এত দীর্ঘ রুকু ও সেজদা করছিলেন যে, আমার ভয় হচ্ছিল আমার নাক দিয়ে বুঝি রক্ত পড়া শুরু হবে! তাই আমি পুরো নামাজে আমার নাক চেপে ধরে রেখেছিলাম।" এটি শুনে রাসূল (সা.) হেসেই আকুল হয়েছিলেন। স্ত্রীদের এমন মিষ্টি আচরণ রাসূল (সা.)-এর বাইরের ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করত।

৫. দানশীলতা ও জেনারোসিটি

স্ত্রী হিসেবে তিনি কখনো ধন-সম্পদের প্রতি লোভী ছিলেন না। রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর যখন হযরত উমর (রা.) খলিফা হলেন, তখন তিনি উম্মুল মুমিনীনদের জন্য ভাতা পাঠাতেন। একবার উমর (রা.) সাওদা (রা.)-এর কাছে দিরহাম (টাকা) ভর্তি একটি থলি পাঠান। সাওদা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "এটি কী?" বাহক বলল, "টাকা।" তিনি বললেন, "খেজুরের মতো থলিতে করে টাকা পাঠানো হয়েছে?" এরপর তিনি তখনই সেই সমস্ত টাকা মদিনার গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দেন।

হযরত সাওদা (রা.)-এর জীবনের শেষ সময় ও ইন্তেকাল

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পরও হযরত সাওদা (রা.) দীর্ঘ সময় বেঁচে ছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো ছিল ইবাদত, দান-সদকা এবং রাসূল (সা.)-এর স্মৃতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত।

- **রাসূল (সা.)-এর প্রতি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আনুগত্য:** বিদায় হজের সময় রাসূল (সা.) তাঁর স্ত্রীদের পর্দার বিধান মেনে ঘরে অবস্থান করার যে নসিহত করেছিলেন, হযরত সাওদা (রা.) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তিনি ঘরের বাইরে খুব একটা বের হতেন না।
- **দানশীলতা:** জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যা-ই পেতেন, তা-ই আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতেন। ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন তাঁর জন্য রাষ্ট্রীয় ভাতা পাঠানো হতো, তিনি নিজের জন্য কিছুই না রেখে সব গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন।
- **ইন্তেকাল:** হযরত সাওদা (রা.) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা **হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতের শেষ দিকে** (হিজরি ২২ বা ২৩ সনে, আনুমানিক ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে) মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

- **দাফন:** উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (রা.)-কে মদিনার বিখ্যাত কবরস্থান **জান্নাতুল বাকিতে** দাফন করা হয়।
-

হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা)

হযরত আয়েশা (রা.)-এর জন্ম এবং শৈশবকাল ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ একটি অধ্যায়। নিচে তাঁর জন্ম ও শৈশবের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

জন্ম ও বংশপরিচয়

- **জন্ম সন:** মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির আনুমানিক চতুর্থ বছরে (৬১৩-৬১৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে) পবিত্র মক্কা নগরীতে হযরত আয়েশা (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।
- **পিতা-মাতা:** তাঁর পিতা ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু **হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)** এবং মাতা ছিলেন **উম্মে রুমান (রা.)**।
- **বংশীয় মর্যাদা:** তিনি কুরাইশ বংশের বনু তাইম গোত্রের সন্তান ছিলেন। জন্মগতভাবেই তিনি একটি সম্পূর্ণ মুসলিম ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেড়ে ওঠেন।

শৈশবকাল ও পারিবারিক পরিবেশ

হযরত আয়েশা (রা.)-এর শৈশব অন্য সাধারণ শিশুদের চেয়ে বেশ আলাদা ছিল, কারণ তাঁর পরিবার ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই এর সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল।

১. ঈমানী পরিবেশ

তিনি নিজেই বলতেন,

"আমি আমার পিতা-মাতাকে ইসলামের অনুসারী ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় দেখিনি।"

অর্থাৎ, তিনি যখন থেকে বুঝতে শিখেছেন, তখন থেকেই ঘরে ইসলামের চর্চা এবং তাওহীদের বাণী শুনে বড় হয়েছেন। জাহেলিয়াত বা মূর্তিপূজার কোনো প্রভাব তাঁর জীবনে ছিল না।

২. তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর স্মৃতিশক্তি

ছোটবেলা থেকেই আয়েশা (রা.) ছিলেন অসাধারণ মেধা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। শৈশবে ঘটে যাওয়া ইসলামের প্রাথমিক যুগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, মুসলমানদের ওপর কোরাইশদের নির্যাতন এবং হিজরতের ঘটনা তিনি হুবহু মনে রাখতে পেরেছিলেন, যা পরবর্তীতে বহু হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

৩. খেলাধুলা ও চপলতা

শৈশবে তিনি বেশ চঞ্চল, প্রাণবন্ত এবং খেলাধুলাপ্রিয় ছিলেন। অন্যান্য সাধারণ শিশুদের মতো তিনিও পুতুল এবং বান্ধবীদের নিয়ে খেলতেন।

- রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন তাঁদের বাড়িতে আসতেন, তখন তিনি আয়েশা (রা.)-এর খেলাধুলায় বাধা দিতেন না, বরং তাঁর বান্ধবীদের ডেকে এনে একসাথে খেলার সুযোগ করে দিতেন।
- তাঁর একটি ডানাওয়ালা খেলনা ঘোড়া ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) সেটি দেখে হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ঘোড়ার আবার ডানা থাকে নাকি?" আয়েশা (রা.) চটপটে উত্তর দিয়েছিলেন, "কেন, সুলায়মান (আ.)-এর ঘোড়ার তো ডানা ছিল!" এই ঘটনাটি তাঁর শৈশবের চতুরতা ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রমাণ দেয়।

৪. লাজুকতা ও শিষ্টাচার

চঞ্চল প্রকৃতির হলেও তাঁর মধ্যে অসাধারণ লজ্জাশীলতা এবং উচ্চমানের নৈতিকতা ছিল। তাঁর মা উম্মে রুমান (রা.) এবং পিতা আবু বকর (রা.) তাঁকে অত্যন্ত আদব-কায়দা ও উচ্চমানের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান দিয়ে গড়ে তোলেন।

সংক্ষেপে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর শৈশব ছিল একাধারে পবিত্র, আনন্দময় এবং জ্ঞানার্জনের একটি সুন্দর প্রস্তুতি পর্ব, যা তাঁকে পরবর্তী জীবনে মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী শিক্ষাবিদ ও হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

রাসুল (সা.) এর সাথে আয়েশা (রা.) বিয়ে

হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিবাহ ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। এই পবিত্র বন্ধনটি সাধারণ কোনো বৈবাহিক সম্পর্কের মতো ছিল না, বরং এর পেছনে ছিল মহান আল্লাহর বিশেষ ঐশী ইশারা এবং গভীর হিকমত (প্রজ্ঞা)।

নিচে এই বিবাহের পটভূমি, আকদ এবং মদীনায় সংসার শুরুর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

১. বিবাহের পটভূমি ও ঐশী ইশারা

হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) মানসিকভাবে একা হয়ে পড়েছিলেন এবং ইসলামের দাওয়াতের কাজে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে তীব্র চাপ আসছিল। এই কঠিন সময়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (রা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

এর কিছুদিন পর আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে বিবাহের ইঙ্গিত আসে। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেই পরবর্তীতে হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন:

"স্বপ্নে তোমাকে দুইবার রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, 'ইনি আপনার স্ত্রী।' আমি যখন কাপড়ের আঁচল সরালাম, তখন দেখলাম সেটা তুমি। আমি মনে মনে বললাম, যদি এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে তিনি অবশ্যই তা বাস্তবায়ন করবেন।" (সহীহ বুখারী)

বিয়ের সময় আয়েশার বয়স (৬ ও ৯ বছর)

উপমহাদেশসহ সারাবিশ্বের সিংহভাগ ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সমাজে এবং বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থগুলোতে এই মতটিই সবচেয়ে বেশি বর্ণিত হয়েছে।

- **আকদ (বিবাহ)-এর সময় বয়স:** নবুয়তের দশম বর্ষে মক্কায় যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাঁর মূল বিবাহ বা আকদ হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল **৬ বছর**।
- **সংসার শুরু (রুশসাত)-এর সময় বয়স:** হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে মদীনায় যখন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল **৯ বছর**।

সূত্র: সহীহ বুখারী (হাদিস নং ৩৮৯৪, ৫১৩৩) এবং সহীহ মুসলিমের বেশ কয়েকটি বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা.) নিজেই তাঁর এই বয়সের কথা উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য, তৎকালীন আরব্য সমাজে মেয়েদের শারীরিক গঠন দ্রুত বৃদ্ধি পেত এবং আবহাওয়া ও সংস্কৃতির কারণে খুব কম বয়সে (ঋতুমতী হওয়ার পর পরই) বিয়ে হওয়াটা অত্যন্ত সাধারণ একটি সামাজিক নিয়ম ছিল। কাফেররা রাসুল (সা.)-এর ঘোর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন সময়ে এই বিয়ে নিয়ে কোনো আপত্তি

তোলেনি, কারণ আরবে এটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল।

②. বিয়ের প্রস্তাব ও মক্কায় 'আকদ' (বিবাহ)

আল্লাহর ইশারা পাওয়ার পর, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফু হযরত খাওলা বিনতে হাকিম (রা.) এই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘরে যান।

- **পারিবারিক আনন্দ:** হযরত আবু বকর (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। রাসুল (সা.)-এর সাথে নিজের কন্যার বিয়ে হওয়াকে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য ও মর্যাদা মনে করেছিলেন।

আকদ সম্পন্ন হওয়া: নবুয়তের দশম বর্ষে (হিজরতের প্রায় তিন বছর আগে) মক্কা নগরীতে অত্যন্ত সাদামাটাভাবে তাঁদের 'আকদ' বা মূল বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স ছিল অল্প এবং তিনি তখনো শৈশবে ছিলেন।

- **পিতার ঘরে অবস্থান:** আকদ সম্পন্ন হলেও হযরত আয়েশা (রা.) তখনই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরে যাননি। প্রথা অনুযায়ী তিনি মক্কাতেই তাঁর পিতা-মাতার ঘরে রয়ে যান এবং স্বাভাবিকভাবে খেলাধুলা ও বেড়ে ওঠার সুযোগ পান।

৩. হিজরত ও মদীনায় বিদায় (রুশসাত)

মক্কার কাফেরদের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলে মুসলমানরা মদীনায় হিজরত করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরিবারও মদীনায় স্থানান্তরিত হয়। মদীনায় আসার পর সেখানকার আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে হযরত আয়েশা (রা.) বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। সুস্থ হওয়ার পর তাঁর মদীনার জীবন শুরু হয়।

হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে (আনুমানিক ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে), বিখ্যাত বদর যুদ্ধের পর হযরত আয়েশা (রা.)-এর আনুষ্ঠানিক বিদায় বা 'রুশসাত' সম্পন্ন হয়।

- **বিদায়ের দিনটি:** হযরত আয়েশা (রা.) নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, যেদিন তাঁর বিদায় হওয়ার কথা, সেদিনও তিনি বাইরে বান্ধবীদের সাথে খেলছিলেন। তাঁর মা উম্মে রুমান (রা.) এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে যান। তাঁর হাত-মুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়।
- **বাসর ঘরে প্রবেশ:** এরপর তাঁকে আনসারদের কিছু নারীর কাছে সমর্পণ করা হয়, যারা তাঁকে দোয়া করেন এবং বরকতের কামনা করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর বাড়িতেই একটি কক্ষে বসা ছিলেন। সেখানে

অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে কোনো জাঁকজমক ছাড়াই আয়েশা (রা.)-কে রাসুল (সা.)-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

- **উপহার ও আপ্যায়ন:** সেই মুহূর্তে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে মেহমানদের আপ্যায়ন করার মতো কেবল এক পাত্র দুধ ছিল। তিনি নিজে সেই দুধ থেকে কিছুটা পান করেন এবং বাকিটা হযরত আয়েশা (রা.)-কে পানের জন্য দেন। লজ্জায় আয়েশা (রা.) মাথা নিচু করে রাখলে তাঁর বান্ধবীরা তাঁকে পাত্রটি হাত বাড়িয়ে নিতে বলেন। আয়েশা (রা.) দুধ পান করার পর রাসুল (সা.) সেখানে উপস্থিত অন্যান্য নারীদেরও তা পান করতে দেন।

৪. এই বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ও হিকমত

অনেকেই আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিবাহের বয়সের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তবে তৎকালীন আরব্য সমাজে এবং ইসলামের ইতিহাসে এই বিবাহের পেছনে বিশাল সামাজিক ও দ্বীনি হিকমত ছিল:

- **বন্ধুত্বের গভীরতা:** হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের জন্য তাঁর সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন। এই বিবাহের মাধ্যমে রাসুল (সা.) এবং আবু বকর (রা.)-এর আত্মিক সম্পর্ক একটি পারিবারিক আত্মীয়তায় রূপ নেয়।

নারী শিক্ষার বিকাশ: ইসলামে নারীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবনের বহু গোপন ও সংবেদনশীল মাসআলা-মাসায়েল রয়েছে, যা পুরুষদের পক্ষে জানা বা প্রচার করা সম্ভব ছিল না। হযরত আয়েশা (রা.) প্রখর মেধার অধিকারী হওয়ায় রাসুল (সা.)-এর গৃহিনী হিসেবে ইসলামের অভ্যন্তরীণ রূপটি খুব কাছ থেকে দেখেন।

- **জ্ঞান ভাণ্ডার:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রা.) প্রায় ৪৮ বছর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি মুসলমানদের প্রধান শিক্ষক ও আইনজ্ঞ (মুফতি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি **২,২১০টি হাদিস** বর্ণনা করেছেন, যা উম্মাহর জন্য এক বিশাল নিয়ামত।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিবাহটি কেবল একটি সাধারণ দাম্পত্যের সূচনা ছিল না, বরং এটি ছিল ইসলামের জ্ঞান ও শরিয়তের অর্ধেক অংশকে পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখার একটি ঐশী মহাপরিকল্পনা।

স্ত্রী হিসেবে কেমন ছিলেন আয়েশা (রা.)

ইসলামী ইতিহাস ও হাদিসের আলোকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী হিসেবে হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত অনন্য, গুণবতী এবং অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দাম্পত্য জীবনে তাঁর ভূমিকা ছিল একাধারে একজন প্রেমময়ী স্ত্রী, প্রখর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সহযোগী এবং দ্বীনের একনিষ্ঠ প্রচারক হিসেবে।

স্ত্রী হিসেবে তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অত্যন্ত প্রিয়তমা

হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম প্রিয় স্ত্রী। একবার সাহাবি আমর ইবনুল আস (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনার কাছে মানুষের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি প্রিয়?" রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিলেন, "আয়েশা।" তাঁদের পারস্পরিক ভালোবাসা ছিল গভীর ও মধুর।

২. বুদ্ধিমত্তা ও প্রখর স্মৃতিশক্তি

তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বিচক্ষণ ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরোয়া ও ব্যক্তিগত জীবনের বহু সুন্নাত ও নিয়ম-কানুন হযরত আয়েশা (রা.)-এর মাধ্যমেই উম্মত জানতে পেরেছে। তিনি প্রায় ২,২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। ইসলামের আইনি ও পারিবারিক বিষয়ে তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ (ইসলামী আইনজ্ঞ)।

৩. গভীর আনুগত্য ও সেবা

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুখ-দুঃখে তিনি সবসময় ছায়ার মতো পাশে ছিলেন। অত্যন্ত সাধারণ এবং অভাব-অনটনের সংসারেও তিনি কখনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আরাম-আয়েশ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং মেসওয়াকের যত্ন নিতেন তিনি নিজে। এমনকি রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন জীবনের শেষ শয্যায় ছিলেন, তখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর বুকেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

৪. স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত সম্পর্ক

রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত। তাঁরা একসঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন, একই পাত্র থেকে পানি পান করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে কৌতুক ও খোশগল্প করতেন। স্ত্রীদের মনস্তত্ত্ব ও আবেগের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা.) কতটা সংবেদনশীল ছিলেন, তা হযরত আয়েশার সঙ্গে তাঁর আচরণ থেকেই সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায়।

৫. ধৈর্য ও আত্মত্যাগ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরে অনেক সময় দিনের পর দিন চুলা জ্বলত না, শুধু খেজুর আর পানি খেয়ে দিন কাটাতে হতো। হযরত আয়েশা (রা.) এই দারিদ্র্য অত্যন্ত হাসিমুখে এবং ধৈর্যের সাথে বরণ করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে যখন তাঁর কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ আসত, তিনি তার প্রায় পুরোটাই গরিব-দুঃখীদের মাঝে দান করে দিতেন এবং নিজে সাধারণ জীবনযাপন করতেন।

সংক্ষেপে:

স্ত্রী হিসেবে হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন একাধারে প্রেমময়ী সঙ্গী, জ্ঞান অন্বেষণের সহযোগী এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গী। মুসলিম নারীদের জন্য আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ ব্যক্তিত্বের এক অনন্য প্রতীক তিনি।

জ্ঞান অন্বেষণে আয়েশা(রা.)

হযরত আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত অনন্য এবং বৈজ্ঞানিক। তিনি কেবল শুনেই কোনো তথ্য মুখস্থ করতেন না, বরং যুক্তির কড়াcolটে ফেলে তা যাচাই করতেন। তাঁর সমসাময়িক অন্য যেকোনো নারীর তুলনায় তাঁর জ্ঞান ছিল অনেক গভীর এবং বহুমুখী।

তিনি মূলত ৪টি প্রধান উপায়ে তাঁর প্রখর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন:

১. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ও প্রশ্ন করার অভ্যাস

জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে বড় উৎস ছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাঁর বৈবাহিক জীবন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে একই ঘরে নয় বছরেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কোনো কিছু না বুঝলে বা তাঁর মনে কোনো খটকা লাগলে সঙ্গে সঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করতেন।

হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো কথা বললে আয়েশা (রা.) সেটি পুরোপুরি না বোঝা পর্যন্ত বারবার প্রশ্ন করে জেনে নিতেন। এই কৌতূহলী মন ও প্রশ্ন করার স্বাধীনতাই তাঁকে ইসলামের সবচেয়ে বড় আইনজ্ঞ (ফকিহ) হতে সাহায্য করেছিল।

২. পারিবারিক পরিবেশ ও বাবা আবু বকর (রা.)-এর প্রভাব

ইসলামের আসার আগে এবং পরেও হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরিবার ছিল মক্কার অন্যতম সম্মানিত ও শিক্ষিত পরিবার।

- **বংশলতিকা ও ইতিহাস:** হযরত আবু বকর (রা.) আরবদের বংশলতিকা (Genealogy) এবং ইতিহাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। বাবার কাছ থেকে আয়েশা (রা.) আরবের ইতিহাস, গোত্রীয় সম্পর্ক এবং প্রাচীন ঘটনাবলি গভীরভাবে শেখেন।
- **আরবি সাহিত্য ও কবিতা:** হযরত আয়েশা (রা.) হাজার হাজার আরবি কবিতা মুখস্থ জানতেন। তিনি নিজেই বলতেন, তিনি প্রখ্যাত কবি লাবিদের অন্তত এক হাজার চরণ মুখস্থ বলতে পারতেন। এই সাহিত্যজ্ঞান তাঁর কথা বলার শৈলী ও বাগ্মিতাকে অসাধারণ করে তুলেছিল।

৩. গভীর পর্যবেক্ষণ ও প্রখর স্মৃতিশক্তি

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবন, ইবাদত, মানুষের সাথে তাঁর আচরণ এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান তিনি খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতেন। মহান আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলেন এক অলৌকিক বা প্রখর স্মৃতিশক্তি। একবার কোনো ঘটনা দেখলে বা শুনলে তিনি তা হুবহু মনে রাখতে পারতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর যখনই সাহাবিদের মধ্যে কোনো জটিল আইনি বা ধর্মীয় বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি হতো, তাঁরা হযরত আয়েশার দ্বারস্থ হতেন। কারণ তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাজের প্রেক্ষাপট ও কারণ (শানে নুযুল) সঠিকভাবে মনে রাখতে পারতেন।

৪. চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জ্ঞান

হযরত আয়েশা (রা.) কেবল ধর্মীয় জ্ঞানই নয়, বরং চিকিৎসা বিজ্ঞানেও (Medicine) দারুণ পারদর্শী ছিলেন। সাহাবিরা একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, *"আপনার কোরআন ও হাদিসের জ্ঞান নিয়ে আমাদের বিস্ময় নেই, কারণ আপনি আল্লাহর রাসুলের স্ত্রী। কিন্তু আপনি চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখলেন কোথা থেকে?"*

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবনের শেষভাগে প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন এবং মদিনার ও আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি দল এসে তাঁর চিকিৎসার জন্য নানা রকমের ভেষজ ওষুধের পরামর্শ দিত। হযরত আয়েশা (রা.) সেসব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, তৈরি করতেন এবং মনে রাখতেন। এভাবেই তিনি তৎকালীন চিকিৎসা বিদ্যায় দক্ষ হয়ে ওঠেন।

ইসলামী ইতিহাসে তাঁর স্থান:

ইমাম যুহরি (র.) বলেছেন: *"যদি সমস্ত মানুষের জ্ঞান এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাকি সব স্ত্রীদের জ্ঞান এক পাল্লায় রাখা হয়, আর হযরত আয়েশার জ্ঞান অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তবে আয়েশার পাল্লাই ভারী হবে।"*

তিনি মোট **২,২১০টি হাদিস** বর্ণনা করেছেন। তাঁর জ্ঞান অর্জনের এই তৃষ্ণা এবং পদ্ধতি প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারী শিক্ষার ওপর কতটা গুরুত্ব দিয়েছে।

রাসূল(সা.) এর সাথে আয়েশা (রা.) এর সফরের ঘটনা

হযরত আয়েশা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বিভিন্ন সামরিক অভিযান, শান্তি চুক্তি এবং হজের সফরে সঙ্গী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আরবের তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখনই কোনো সফরে বা যুদ্ধে যেতেন, তখন স্ত্রীদের মধ্যে লটারি (কুরআহ) করতেন। লটারিতে যাঁর নাম উঠত, তিনিই সেই সফরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গী হতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সফরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ছিলেন। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ (মায়রেসী'র যুদ্ধ) এবং 'ইফকের' ঘটনা

ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ হযরত আয়েশা (রা.)-এর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় সফর। লটারির মাধ্যমে তিনি এই সফরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গী হন। এই সফরটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি কারণে:

- **তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণ হওয়া:** সফরের এক পর্যায়ে 'বাইদা' নামক স্থানে হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি পুঁতির হার হারিয়ে যায়। সেটি খোঁজার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবিরা সেখানে অবস্থান নেন। কিন্তু সেখানে কোনো পানি ছিল না এবং সাহাবিদের সাথেও পানি ছিল না। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ মুসলমানদের জন্য পানির বিকল্প হিসেবে মাটি দিয়ে **তায়াম্মুম** করার আয়াত (সূরা মায়িদা: ৬) নাজিল করেন। সাহাবিরা খুশিতে বলেছিলেন, "হে আবু বকরের পরিবার! এটিই আপনাদের প্রথম বরকত নয় (এর আগেও আপনাদের উসিলায় অনেক বরকত এসেছে)।"
- **ইফকের ঘটনা (অপবাদ ও পবিত্রতা ঘোষণা):** যুদ্ধ শেষে মদিনায় ফেরার পথে হযরত আয়েশা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে হাওদা (উটের পিঠের বসার স্থান)

থেকে নেমে কিছুটা দূরে যান। ফিরে এসে দেখেন তাঁর গলার হারটি আবার হারিয়ে গেছে। তিনি তা খুঁজতে যান। ইতিমধ্যে কাফেলা রওনা হয়ে যায়। যেহেতু তিনি তখন বেশ হালকা গড়নের ছিলেন, তাই বাহকরা বুঝতে পারেনি যে হাওদাটি খালি। কাফেলা চলে গেলে তিনি সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকেন এবং সাহাবি সাফওয়ান ইবনুল মুয়াত্তাল (রা.), যাঁর দায়িত্ব ছিল কাফেলার ফেলে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে নেওয়া, তিনি আয়েশা (রা.)-কে দেখে সসম্মানে নিজের উটে চড়িয়ে মদিনায় নিয়ে আসেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মদিনার মুনাফিকরা হযরত আয়েশার নামে মিথ্যা অপবাদ রটায়। দীর্ঘ এক মাস পর স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নূরের ১০-২১ নম্বর আয়াত নাজিল করে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সম্পূর্ণ পবিত্রতা ও সতীত্ব ঘোষণা করেন।

২. হুদায়বিয়ার সন্ধির সফর

ষষ্ঠ হিজরি সনের জিলকদ মাসে রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন ১৪০০ সাহাবি নিয়ে ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওনা হন, তখন হযরত আয়েশা (রা.)ও সেই কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কুরাইশদের বাধায় মুসলমানরা মক্কায় প্রবেশ করতে না পেরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে অবস্থান নেয়। সেখানে ঐতিহাসিক 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' স্বাক্ষরিত হয়। এই সফরে হযরত আয়েশা (রা.) পুরো পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন এবং এর আইনি ও রাজনৈতিক দিকগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

৩. খয়বর যুদ্ধ ও বিজয়ের সফর

সপ্তম হিজরিতে মদিনার উত্তরে অবস্থিত ইহুদিদের শক্তিশালী দুর্গ খয়বর অভিযানের সময়ও হযরত আয়েশা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ছিলেন। মুসলিম নারীরা এই সফরে সাধারণত আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা করা, পানি পান করানো এবং রান্নাবান্নার কাজে অংশ নিতেন। খয়বর বিজয়ের পর যখন বিপুল পরিমাণ গণিমত (যুদ্ধের সম্পদ) লাভ হয়, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) স্ত্রীদের জন্য বার্ষিক খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) এই ঐতিহাসিক বিজয়ের আনন্দ ও ত্যাগের দিনগুলোর প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলেন।

৪. মক্কা বিজয়

অষ্টম হিজরিতে রমজান মাসে যখন ১০,০০০ সাহাবির বিশাল বাহিনী নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয় করেন, তখন হযরত আয়েশা (রা.) এই ঐতিহাসিক ও গৌরবময় সফরের সঙ্গী ছিলেন। শৈশবে যে মক্কা শহর থেকে তাঁর পরিবারকে হিজরত করতে

হয়েছিল, সেখানে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করার অনুভূতি তিনি খুব কাছ থেকে অনুভব করেছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ক্ষমাশীলতা ও সাধারণ ক্ষমার দৃশ্য বর্ণনা করেছেন।

৫. বিদায় হজ (দশম হিজরি)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের শেষ এবং একমাত্র হজে (বিদায় হজ) তাঁর সমস্ত স্ত্রীগণ সাথে ছিলেন, যার মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন অন্যতম। এই সফরে তাঁর সাথে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে:

- মক্কার কাছাকাছি 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছালে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঋতুস্রাব (মাসিক) শুরু হয়। ওমরাহ করতে পারবেন না ভেবে তিনি কাঁদছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর তাঁবুতে এসে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, *"এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ আদম-কন্যাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। সুতরাং হাজিরা যা যা করে (আরাফাতে যাওয়া, দোয়া করা ইত্যাদি) তুমিও তাই করো, কেবল পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কাবার তাওয়াফ করো না।"*
- পরবর্তীতে হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে রাসুলুল্লাহ (সা.) আয়েশা (রা.)-এর মনের সন্তুষ্টির জন্য তাঁর ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে নির্দেশ দেন আয়েশাকে 'তানঈম' (বর্তমানে যা মসজিদ-ই-আয়েশা নামে পরিচিত) নামক স্থানে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে নতুন করে এহরাম বেঁধে ওমরাহ করিয়ে আনতে।

সফরের অন্যান্য দিক ও পারস্পরিক হৃদ্যতা

সফরগুলো কেবল কষ্ট বা যুদ্ধের ছিল না, বরং এর মধ্যে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও হযরত আয়েশার মধুর দাম্পত্য জীবনের দারুণ বহিঃপ্রকাশ ঘটত।

- **দৌড় প্রতিযোগিতা:** এমনই এক সফরে কাফেলা যখন কিছুটা এগিয়ে যায়, রাসুলুল্লাহ (সা.) আয়েশাকে বলেন, "এসো, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করি।" প্রথমবার আয়েশা (রা.) জিতে যান। কয়েক বছর পর অন্য এক সফরে যখন আয়েশার শরীর কিছুটা ভারী হয়েছিল, তখন আবার প্রতিযোগিতা হলে রাসুলুল্লাহ (সা.) জিতে যান এবং হাসতে হাসতে বলেন, "এটি আগের বারের প্রতিশোধ।"

শিক্ষণীয় দিক:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে এই দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় সফরগুলোর কারণেই হযরত আয়েশা (রা.) ইসলামের যুদ্ধনীতি, সফরকালীন ইবাদতের নিয়ম (যেমন: কসর নামাজ, তায়াম্মুম, হজের নিয়ম) এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন, যা তিনি পরবর্তীতে উম্মতের কাছে নিখুঁতভাবে পৌঁছে দিয়েছেন।

আয়েশা (রা.)প্রতি রাসুল (সা.) ভালোবাসা

হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ভালোবাসা ছিল অত্যন্ত গভীর, নির্মল এবং অনন্য। ইসলামের ইতিহাসে তাঁদের এই ভালোবাসা দাম্পত্য জীবনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রতি এই বিশেষ ভালোবাসার কথা কখনো লুকিয়ে রাখেননি, বরং সাহাবিদের সামনেও তা অকপটে প্রকাশ করেছেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সেই গভীর ভালোবাসার কিছু সুন্দর ও আবেগঘন দিক নিচে তুলে ধরা হলো:

১. অকপটে ভালোবাসার ঘোষণা

সাহাবি আমর ইবনুল আস (রা.) একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, *"ইয়া রাসুলাল্লাহ! দুনিয়াতে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে?"* রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো দ্বিধা ছাড়াই সবার সামনে উত্তর দিয়েছিলেন, *"আয়েশা।"*

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, *"পুরুষদের মধ্যে কে?"* রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, *"তার পিতা (অর্থাৎ আবু বকর)।"*

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, হযরত আয়েশাকে ভালোবাসা এবং তা প্রকাশ করাকে রাসুলুল্লাহ (সা.) কতটা স্বাভাবিক ও আনন্দের মনে করতেন।

২. আয়েশার পাত্রে মুখ রেখে পানাহার

হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের একটি অন্যতম মিষ্টি মাধ্যম ছিল তাঁদের একসাথে খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন:

- *"আমি যখন পাত্র থেকে পানি পান করতাম, রাসুলুল্লাহ (সা.) পাত্রটি নিয়ে ঠিক সেই জায়গায় মুখ রেখে পানি পান করতেন, যেখানে আমার ঠোঁট লেগেছিল।"*
- কোনো হাড়ের টুকরো থেকে মাংস খাওয়ার সময় আয়েশা (রা.) যে অংশ থেকে কামড় দিতেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে সেই টুকরোটি নিয়ে ঠিক একই জায়গায় মুখ দিয়ে মাংস খেতেন।

৩. নামের সুন্দর ডাক (উপনাম)

রাসুলুল্লাহ (সা.) ভালোবেসে হযরত আয়েশাকে বিভিন্ন সুন্দর নামে ডাকতেন। কখনো তিনি ডাকতেন **'আয়েশ'** (আরবিতে নামের শেষের অক্ষর বাদ দিয়ে ডাকা গভীর ভালোবাসার প্রতীক)।

আবার কখনো ডাকতেন **'হুমায়রা'** বলে। 'হুমায়রা' শব্দের অর্থ হলো 'গোলাপী বা লালচে রঙের অধিকারী'। হযরত আয়েশা দেখতে অত্যন্ত ফর্সা ও সুন্দরী ছিলেন বলে রাসুলুল্লাহ (সা.) আদর করে এই নামে ডাকতেন।

৪. আয়েশার মেজাজ বুঝতে পারা

রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত আয়েশার মনের ভাব ও অভিমান খুব দ্রুত ধরে ফেলতে পারতেন। একদিন তিনি আয়েশাকে বললেন, *"আয়েশা, তুমি কখন আমার ওপর খুশি থাকো আর কখন রাগ করে থাকো, তা আমি খুব ভালো করেই জানি।"*

আয়েশা (রা.) অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, *"কীভাবে বোঝেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ?"*

রাসুলুল্লাহ (সা.) হেসে বললেন, *"যখন তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকো, তখন কথার মাঝে বলো—'মুহাম্মাদের রবের কসম!' আর যখন তুমি কোনো কারণে অভিমান করে থাকো, তখন বলো—'ইব্রাহীমের রবের কসম!'"*

হযরত আয়েশা লজ্জিত হয়ে হেসে দিলেন এবং বললেন, *"আল্লাহর কসম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! রাগের মাথায় আমি কেবল আপনার নামটাই মুখে নেওয়া বন্ধ করি, মন থেকে তো আপনার ভালোবাসা কখনো দূর হয় না।"*

৫. আয়েশার আনন্দের প্রতি খেয়াল রাখা

হযরত আয়েশা (রা.) বয়সে তরুণী ছিলেন বলে তাঁর খেলাধুলা বা বিনোদনের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা.) বেশ খেয়াল রাখতেন।

- একবার মদিনায় কিছু আবিসিনিয়ার মানুষ লাঠিখেলা দেখাচ্ছিল। হযরত আয়েশা তা দেখতে চাইলে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে দরজার সামনে দাঁড়ান এবং আয়েশা (রা.) তাঁর কাঁধের ওপর চিবুক রেখে রাসুলের আড়াল থেকে সেই খেলা উপভোগ করেন। যতক্ষণ না আয়েশা নিজে থেকে ক্লান্ত হয়ে খেলা দেখা বন্ধ করেছেন, ততক্ষণ রাসুলুল্লাহ (সা.) ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।
- এছাড়া সফরে গিয়ে দুজনের সেই বিখ্যাত দৌড় প্রতিযোগিতার ঘটনা তো রয়েছেই, যা তাঁদের সম্পর্ককে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

৬. জীবনের শেষ মুহূর্তটি আয়েশার কোলে

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন তিনি তীব্র অসুস্থ ছিলেন, তখন তিনি তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে হযরত আয়েশার ঘরে অবস্থান করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এটি আল্লাহর অন্যতম বড় নেয়ামত যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার ঘরে, আমার পালার দিনে এবং আমার বুক ও থুতনির মাঝে (মাথা রেখে) ইন্তেকাল করেছেন।

এমনকি শেষ মুহূর্তে রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন মেসওয়াক করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু চিবানোর শক্তি পাচ্ছিলেন না, তখন হযরত আয়েশা নিজের দাঁত দিয়ে সেই মেসওয়াকটি নরম করে রাসুলের মুখে তুলে দিয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করার সময় তাঁর পবিত্র লালা হযরত আয়েশার লালার সাথে মিশে গিয়েছিল।

একটি সুন্দর দোয়া:

হযরত আয়েশা (রা.) একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলেছিলেন, *"ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার জন্য দোয়া করুন।"* রাসুলুল্লাহ (সা.) হাত তুলে দোয়া করলেন, *"হে আল্লাহ! আয়েশার আগের-পরের, ভেতরের-বাইরের সমস্ত গুনাহ খাতা মাফ করে দিন।"*

এই দোয়া শুনে হযরত আয়েশা খুশিতে এতই হাসলেন যে তাঁর মাথা রাসুলের কোলে গড়িয়ে পড়ল। রাসুলুল্লাহ (সা.) তখন বললেন, *"আমার এই দোয়াটি কিন্তু আমি আমার উম্মতের জন্য প্রতি নামাজের পর করে থাকি।"*

রাসুল (সা.) এর ওফাতের সময় আয়েশা (রা.)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত বা ইন্তেকালের সময়টি ছিল ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক মুহূর্ত, আর সেই চরম মুহূর্তে তাঁর সবচেয়ে কাছে ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.)। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের শেষ দিনগুলো এবং তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পুরো সময়টি হযরত আয়েশার ঘরে এবং তাঁর কোলেই অতিবাহিত হয়েছিল।

নিচে সেই আবেগঘন ও ঐতিহাসিক মুহূর্তটির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

১. আয়েশা (রা.)-এর ঘরে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ

মৃত্যুর তীব্র অসুস্থতার দিনগুলোতে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর স্ত্রীদের ঘরে পালাক্রমে অবস্থান করছিলেন। তবে অসুস্থতা যখন অনেক বেড়ে গেল, তখন তিনি বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, *"আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব?"* বা *"আমি আজ কোথায়?"* তাঁর অন্য স্ত্রীগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) আয়েশার ঘরে থাকতে চাচ্ছেন। তাই তাঁরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে নিজেদের পালা হযরত আয়েশাকে উৎসর্গ

করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে হযরত আয়েশার ঘরে স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি দেন।

২. আয়েশার বুকে মাথা রেখে শেষ দিনগুলো

হযরত আয়েশা (রা.) নিজেই সেই দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, এটি মহান আল্লাহর বিশেষ অনুকম্পা যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার ঘরে এবং আমার পালার দিনে ইন্তেকাল করেছেন। তীব্র ব্যথার সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত আয়েশার কোল ও বুকের মাঝে মাথা হেলান দিয়ে শুয়ে থাকতেন। আয়েশা (রা.) তাঁর সুস্থতার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাত মোবারক নিজের হাতে নিয়ে সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস (মুআওবিজাতাইন) পড়ে ফুঁ দিতেন এবং সেই বরকতময় হাত রাসুলের শরীরে বুলিয়ে দিতেন।

৩. মেসওয়াক নরম করে দেওয়া

ইন্তেকালের ঠিক কিছু সময় আগে হযরত আয়েশার ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) একটি কাঁচা মেসওয়াক হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তখন আয়েশার বুকে হেলান দিয়ে ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) মেসওয়াকটির দিকে এমনভাবে তাকালেন, যা দেখে আয়েশা (রা.) বুঝতে পারলেন তিনি মেসওয়াক করতে চান।

আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, *"আমি কি এটি আপনার জন্য নিয়ে নেব?"* রাসুলুল্লাহ (সা.) মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। কিন্তু মেসওয়াকটি ছিল বেশ শক্ত এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চিবানোর মতো শক্তি তখন ছিল না। আয়েশা (রা.) তখন বললেন, *"আমি কি এটি আপনার জন্য নরম করে দেব?"* তিনি আবারও ইতিবাচক ইশারা করলেন। তখন হযরত আয়েশা নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে মেসওয়াকটি নরম করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে দেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত সুন্দরভাবে মেসওয়াক করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) গর্ব করে বলতেন, *"আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত হলো, রাসুলের ইন্তেকালের মুহূর্তে তাঁর পবিত্র লালা আর আমার লালা একসাথে মিশে গিয়েছিল।"*

৪. পানির পাত্র এবং শেষ বাণী

মেসওয়াক করার পর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে একটি চামড়ার পাত্রে পানি রাখা ছিল। তিনি বারবার পানির পাত্রে হাত ডুবাচ্ছিলেন এবং সেই ভেজা হাত নিজের পবিত্র মুখমণ্ডলে মুছছিলেন আর বলতেন:

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই), নিশ্চয়ই মৃত্যুর বড় যন্ত্রণা রয়েছে।"

এরপর তিনি আকাশের দিকে হাত বা আঙুল উঁচিয়ে তিনবার বললেন:
"বালির রফীকল আ'লা" (অর্থ: বরং আমি সর্বোচ্চ বন্ধুর—অর্থাৎ আল্লাহর সান্নিধ্য চাই)।

৫. আয়েশার কোলেই শেষ নিঃশ্বাস

এই দোয়াটি করার পরপরই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতটি আস্তে করে ঝুলে পড়ে এবং তাঁর পবিত্র চোখ দুটি স্থির হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রা.) বুঝতে পারেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) আর আমাদের মাঝে নেই, তিনি রফীফে আলার (আল্লাহর) দরবারে চলে গেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন সুস্থ ছিলেন তখন বলতেন, *"কোনো নবীর আত্মা ততক্ষণ পর্যন্ত কবজ করা হয় না, যতক্ষণ না জান্নাতে তাঁর ঠিকানা তাঁকে দেখানো হয় এবং দুনিয়ায় থাকা বা চলে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর পছন্দ জানতে চাওয়া হয়।"* শেষ মুহূর্তে রাসুলের বাণী শুনে আয়েশা (রা.) বুঝেছিলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের চেয়ে মহান আল্লাহকে বেছে নিয়েছেন।

৬. ওফাতের পর আয়েশা (রা.)-এর শোক

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রা.) গভীর শোকে ভেঙে পড়েন। তিনি আলতো করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র মাথা মোবারক কোল থেকে নামিয়ে বালিশের ওপর রাখেন এবং মদিনার অন্যান্য নারীদের সাথে শোকে শামিল হন।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত বা ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রা.)-এর ওপর দিয়ে যে শোকের ঝড় বয়ে গিয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। তিনি কেবল তাঁর প্রিয়তম স্বামীকেই হারাননি, হারিয়েছিলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ অভিভাবক এবং আল্লাহর রাসুলকে। অত্যন্ত কম বয়সে (আনুমানিক ১৮ বছর বয়সে) তিনি বিধবা হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিরহ বেদনা বুকে নিয়ে বেঁচে ছিলেন। ওফাতের পর তাঁর শোকের গভীরতা ও পরবর্তী জীবন কেমন ছিল, তা নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. তাৎক্ষণিক শোকের আঘাত ও কান্না

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পর হযরত আয়েশা (রা.) গভীর শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়েন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, রাসুলের চোখ দুটি যখন স্থির হয়ে গেল, তখন তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রাসুলের পবিত্র মাথাটি নিজের কোল থেকে নামিয়ে বালিশের ওপর রাখেন। এরপর তিনি ঘরের দরজা খুলে মদিনার অন্যান্য নারীদের এই খবর দেন এবং তাঁদের সাথে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

মদিনার আকাশে-বাতাসে তখন শোকে মাতম চলছিল, আর হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার দিনটি পার করছিলেন।

২. প্রিয়তমের শিয়রেই বসবাস

সাহাবিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরের ভেতরেই দাফন করা হয়। অর্থাৎ, যে ঘরে তিনি ঘুমাতেন, খেতেন এবং থাকতেন, সেখানেই শায়িত হলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)।

স্বাভাবিকভাবে এটি যেকোনো মানুষের জন্য অত্যন্ত আবেগঘন ও শোকাবহ। হযরত আয়েশা (রা.) জীবনের বাকি ৪৭ বছর সেই ঘরের একপাশে কাটিয়ে দেন। তিনি প্রতিদিন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কবরের পাশে এসে দাঁড়াতেন, সালাম দিতেন এবং রাসুলের সাথে কাটানো স্মৃতিগুলো মনে করে কাঁদতেন।

৩. বাবা আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর দ্বিগুণ শোক

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের মাত্র আড়াই বছর পর হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত আবু বকর (রা.)-কে হারান। মৃত্যুর পর আবু বকর (রা.)-কেও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পাশেই দাফন করা হয়।

এই ঘটনা আয়েশা (রা.)-এর শোককে আরও বাড়িয়ে দেয়। তিনি বলতেন, যতদিন শুধু রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং আমার পিতা এই ঘরে শায়িত ছিলেন, আমি পর্দার ব্যাপারে কিছুটা শিথিল থাকতাম (কারণ দুজনই তাঁর অতি আপনজন)। কিন্তু পরবর্তীতে যখন হযরত উমর (রা.)-কে তাঁদের পাশে দাফন করা হয়, তখন থেকে আমি ঘরের ভেতরেও সবসময় শক্তভাবে পর্দা বজায় রাখতাম এবং উমরের প্রতি লজ্জাবোধ করতাম।

৪. আমরণ সাদামাটা জীবন ও ভোগ-বিলাস বর্জন

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর ইসলামের পরিধি অনেক বেড়ে যায়, পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের পর মদিনায় বিপুল ধন-সম্পদ আসতে শুরু করে। খলিফাদের পক্ষ থেকে রাসুলের স্ত্রীদের জন্য বড় অঙ্কের ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু হযরত

আয়েশা (রা.) রাসুলের বিরহ ও শোক ভুলে থাকার জন্য এবং রাসুলের দেখানো সাদামাটা জীবন ধরে রাখার জন্য এক অনন্য পথ বেছে নেন:

- তাঁর কাছে লাখ লাখ দিরহাম আসার পরও তিনি নিজের জন্য একটি নতুন কাপড়ও রাখতেন না।
- যেদিনই টাকা আসত, রোজা থাকা অবস্থায় তিনি দিন শেষ হওয়ার আগেই তা গরিব, এতিম ও বিধবাদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। অনেক সময় ইফতার করার জন্য ঘরে সামান্য তেল বা রুটিও অবশিষ্ট থাকত না।

৫. স্মৃতির রোমন্থন ও চোখের পানি

পরবর্তী জীবনে যখনই উম্মতের কোনো সাহাবি বা তাবেয়ি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন বা তাঁর ইন্তেকালের সময়কার ঘটনা জানতে চাইতেন, তিনি তা বর্ণনা করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ত। বিশেষ করে মেসওয়াক নরম করে দেওয়া এবং রাসুলের শেষ বাণীর কথা বলার সময় তিনি কেঁদে ফেলতেন।

শোকের রূপান্তর:

হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর এই গভীর ব্যক্তিগত শোককে এক বিশাল শক্তিতে রূপান্তর করেছিলেন। তিনি ঘরের কোণে বসে শুধু কেঁদে দিন পার করেননি, বরং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রেখে যাওয়া দ্বীনকে উম্মতের কাছে পৌঁছে দেওয়াকে নিজের জীবনের মূল ব্রত বানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন মদিনার প্রধান শিক্ষক এবং ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী ও পণ্ডিত।

আয়েশা (রা.) এর ইন্তেকাল

হযরত আয়েশা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর প্রায় ৪৭ বছর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং আইনি সমস্যার সমাধানে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেন। অবশেষে ৫৮ হিজরি সনের ১৭ রমজান (মোতাবেক ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ) মঙ্গলবার রাতে রমজানের বরকতময় মাসে এই মহান নারী ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৬৪ বা ৬৫ বছর। নিচে তাঁর ইন্তেকাল ও দাফন সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

১. মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তের মানসিক অবস্থা ও বিনয়

হযরত আয়েশা (রা.) যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন মদিনার বিশিষ্ট সাহাবিরা তাঁকে দেখতে আসতেন। একদিন বিখ্যাত সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। আয়েশা (রা.) প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করছিলেন (কারণ তিনি প্রশংসা শুনতে চাচ্ছিলেন না), কিন্তু ভাগ্নে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের অনুরোধে অনুমতি দেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) ঘরে প্রবেশ করে তাঁর প্রশংসা করে বললেন, *"হে উম্মুল মুমিনীন! আনন্দিত হোন। আপনার এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের মাঝে কেবল রুহটি বের হওয়ার ব্যবধানটুকু বাকি আছে। আপনি ছিলেন রাসুলের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী। স্বয়ং আল্লাহ আসমান থেকে আপনার পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়ে আয়াত নাজিল করেছেন।"*

ইবনে আব্বাসের এই প্রশংসার জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন:

"হে ইবনে আব্বাস! তুমি আমার প্রশংসা করছ? আল্লাহর কসম! আমার তীব্র ইচ্ছা হয় যদি আমি একটি সাধারণ ঘাস হতাম! আমার ইচ্ছা হয় যদি আমি এমন কিছু হতাম যাকে মানুষ ভুলেই গেছে (অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতার ভয়ে তিনি এতটা বিনয়ী ছিলেন)।"

২. শেষ অসিয়ত (দাফনের স্থান নির্বাচন)

হযরত আয়েশা (রা.)-এর তীব্র ইচ্ছা ছিল যে, মৃত্যুর পর তাঁকে যেন তাঁর হুজরায় রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর পিতা আবু বকর (রা.)-এর পাশেই দাফন করা হয়। সেখানে তাঁর জন্য একটি জায়গাও খালি ছিল।

কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর অসিয়ত পরিবর্তন করেন। তিনি ভাগ্নে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে ডেকে বলেন, *"আমাকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে দাফন করো না। বরং মদিনার সাধারণ কবরস্থান 'জান্নাতুল বাকি'-তে রাসুলের অন্যান্য স্ত্রীদের (উম্মাহাতুল মুমিনীন) সাথেই দাফন করো। কারণ, আমি চাই না যে আমার কবরকে কেন্দ্র করে মানুষ অতিরিক্ত প্রশংসা করুক বা আমাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা ভাবা হোক।"* তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর চরম আত্মত্যাগ ও বিনম্রতার এক অনন্য উদাহরণ।

৩. জানাজা ও দাফন

হযরত আয়েশা (রা.) রমজান মাসের ১৭ তারিখ রাতে (উইতরের সালাতের পর) ইন্তেকাল করেন। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী রাতেই তাঁকে দাফন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

- **জানাজার ইমামতি:** মদিনার তৎকালীন গভর্নর ও প্রখ্যাত সাহাবি **হযরত আবু হুরায়রা (রা.)** তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান।
- **সাহাবি ও মানুষের ঢল:** গভীর রাত হওয়া সত্ত্বেও মদিনার ইতিহাসে এত বিশাল মানুষের সমাগম খুব কম জানাজাতেই দেখা গিয়েছিল। মদিনার আনসার, মুহাজির এবং দলে দলে নারীরা গভীর রাতে মদিনার রাস্তায় নেমে আসেন এই মহান বিদুষী নারীকে শেষ বিদায় জানাতে। তৎকালীন ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মদিনার রাতটি সেদিন মানুষের ভিড় এবং চোখের পানিতে এক আবেগঘন আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।
- **কবরে নামানো:** হযরত আয়েশা (রা.)-এর আপন কোনো সন্তান ছিল না। তাই তাঁর অসিয়ত ও প্রথা অনুযায়ী তাঁর বোনের ছেলে (ভাগ্নে) আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ এবং পরিবারের অন্যান্য নিকটাত্মীয়রা তাঁকে জান্নাতুল বাকির পবিত্র মাটিতে দাফন করেন।

একটি যুগের অবসান:

হযরত আয়েশা (রা.)-এর ইন্তেকালের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান ঘটে। তিনি তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ভালোবাসা এবং ত্যাগের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর অন্তরে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কেয়ামত পর্যন্ত তিনি বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মুসলিম নারীর জন্য "উম্মুল মুমিনীন" বা মুমিনদের জননী হিসেবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

.

হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)

হযরত হাফসা (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম স্ত্রী (উম্মুল মুমিনীন) এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, বিচক্ষণ এবং কুরআন ও ইসলামি জ্ঞানে পারদর্শী এক অনন্য নারী।

তাঁর জন্ম এবং শৈশবকালীন জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত নিচে আলোচনা করা হলো:

১. জন্ম ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

হযরত হাফসা (রা.) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের 'বনু আদি' গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল জয়নব বিনতে মজউন (যিনি প্রখ্যাত সাহাবি হযরত উসমান ইবনে মজউনের বোন ছিলেন)।

- **জন্মের বছর:** ইসলামের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছরে তাঁর জন্ম হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির আনুমানিক পাঁচ বছর আগে, যখন কুরাইশরা পবিত্র কাবা ঘর পুনর্নির্মাণ করছিল, সেই বছর হযরত হাফসা (রা.) ভূমিষ্ঠ হন (আনুমানিক ৬০৫ খ্রিস্টাব্দ)।
- **নামকরণ:** আরবরা সাধারণত সাহসী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব বোঝাতে এই নামটি ব্যবহার করত (আরবিতে 'হাফসা' শব্দের একটি অর্থ সিংহের বাচ্চা)। বাবার মতো তাঁর মধ্যেও শৈশব থেকেই এক ধরনের দৃঢ়তা ও সাহসিকতা লক্ষ্য করা যেত।

২. শৈশব ও পারিবারিক পরিবেশ

হযরত হাফসা (রা.)-এর শৈশব কেটেছে মক্কার এক অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পারিবারিক পরিবেশে।

- **বাবার প্রভাব:** তাঁর বাবা হযরত উমর (রা.) ছিলেন তৎকালীন আরবের অন্যতম শিক্ষিত, সাহসী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। বাবার ব্যক্তিত্বের গভীর প্রভাব হাফসা (রা.)-এর ওপর পড়েছিল। তিনি শৈশব থেকেই স্পষ্টভাষী, নির্ভীক এবং আত্মমর্যাদাশীল হিসেবে গড়ে ওঠেন।
- **শিক্ষা-দীক্ষা (লেখাপড়া জানা নারী):** তৎকালীন আরব সমাজে যেখানে পুরুষদের মধ্যেই শিক্ষার হার ছিল অত্যন্ত সীমিত, সেখানে হযরত হাফসা (রা.) শৈশবেই লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন। তাঁর এই শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং মেধা তাঁকে

সমসাময়িক অন্য মেয়েদের চেয়ে আলাদা করে তুলেছিল। পরবর্তীতে তাঁর এই লেখার ও পড়ার দক্ষতাই ইসলামের ইতিহাসে (কুরআন সংকলনে) এক বিরাট অবদান রাখতে সাহায্য করেছিল।

৩. ইসলাম গ্রহণ ও শৈশবের অবসান

হযরত হাফসা (রা.) যখন শৈশব পার করে কৈশোরে পদার্পণ করছেন, ঠিক তখনই মক্কায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে।

শুরুতে তাঁর বাবা হযরত উমর (রা.) ইসলামের ঘোর বিরোধী থাকলেও, পরবর্তীতে নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর পুরো পরিবার একযোগে মুসলিম হয়ে যায়। হযরত হাফসা (রা.)-ও তাঁর কিশোর বয়সেই অত্যন্ত আনন্দের সাথে ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারের ওপর যে মানসিক ও সামাজিক চাপ তৈরি হয়েছিল, তা তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেন।

শৈশবের শিক্ষা ও পরবর্তী জীবন:

শৈশবে অর্জন করা শিক্ষা, সাহসিকতা এবং বাবা উমর (রা.)-এর কাছ থেকে পাওয়া দৃঢ়চেতা মনোভাবই পরবর্তীতে হযরত হাফসা (রা.)-কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যোগ্য সহধর্মিণী হতে এবং ইসলামের প্রথম লিখিত কুরআনের পাণ্ডুলিপি (সহিফা) নিজের হেফাজতে রাখার মতো মহান দায়িত্ব পালনে সাহায্য করেছিল।

হযরত হাফসা (রা.)-এর প্রথম বিবাহ এবং ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. ইসলাম গ্রহণ

হযরত হাফসা (রা.) তাঁর কিশোর বয়সেই অত্যন্ত সৌভাগ্যবানদের একজন হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

- **ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট:** নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে তাঁর পিতা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) যখন ইসলামের ঘোর বিরোধিতা ছেড়ে মহান আল্লাহর একত্ববাদ কবুল করেন, তখন তাঁর পুরো পরিবার একযোগে মুসলিম হয়ে যায়।
- **দৃঢ়তা:** বাবার ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই কিশোরী হাফসা (রা.)-ও মক্কায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইসলাম কবুল করেন। তৎকালীন মক্কার মুশরিকদের চরম অত্যাচার ও সামাজিক বয়কটের মুখেও তিনি ঈমানের ওপর অবিচল ছিলেন।

২. প্রথম বিবাহ

ইসলাম গ্রহণের পর মক্কাতেই হযরত হাফসা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে সম্পন্ন হয়।

- **স্বামীর পরিচয়:** তাঁর প্রথম স্বামীর নাম ছিল **হযরত খুনাইস ইবনে হুজাফা আস-সাহমি (রা.)**। তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশ বংশের বনু সাহম গোত্রের একজন অত্যন্ত সম্মানিত ও বীর সাহাবি। হযরত খুনাইস (রা.) ছিলেন ইসলামের একদম শুরুর দিকের (সাবেকুনাল আউয়ালুন) মুসলিমদের একজন, যিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।
- **একটি আদর্শ দাম্পত্য ও হিজরত:** হযরত হাফসা (রা.) এবং খুনাইস (রা.)-এর দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত দ্বীনি ও ত্যাগে ভরা। মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে এই দম্পতি প্রথমে আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করেন। পরবর্তীতে পরিস্থিতি অনুকূলে এলে তাঁরা মক্কায় ফিরে আসেন এবং আল্লাহর নির্দেশে পুনরায় মদিনায় হিজরত করেন। ফলে হযরত হাফসা (রা.) ইসলামের ইতিহাসের দুটি মহান হিজরতেরই অংশীদার ছিলেন।

৩. বদর যুদ্ধ এবং স্বামীর শাহাদাত (বিধবা হওয়া)

দ্বিতীয় হিজরিতে যখন ইসলামের প্রথম মহাসমগ্রাম 'বদর যুদ্ধ' সংঘটিত হয়, তখন হযরত হাফসা (রা.)-এর স্বামী হযরত খুনাইস (রা.) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন।

- যুদ্ধে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। যুদ্ধ শেষ করে মদিনায় ফিরে আসার পর এই আঘাতের কারণেই তিনি দীর্ঘ অসুস্থতার পর শাহাদাত বরণ করেন।
- স্বামীর শাহাদাতের সময় হযরত হাফসা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত তরুণী (আনুমানিক ১৮ বা ১৯ বছর বয়স)। মদিনার এই কঠিন পরিস্থিতিতে প্রিয় স্বামীকে হারিয়ে তিনি গভীর শোকে ভেঙে পড়েন এবং অল্প বয়সেই বিধবা জীবনের মুখোমুখি হন।

পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা:

হযরত হাফসা (রা.)-এর প্রথম স্বামী হযরত খুনাইস (রা.) যখন বদর যুদ্ধের আঘাতের কারণে মদিনায় শাহাদাত বরণ করেন, তখন হাফসা (রা.) মাত্র ১৮ বা ১৯ বছরের এক তরুণী। এই অল্প বয়সে মেয়ের বিধবা হয়ে যাওয়া এবং তাঁর একাকীত্ব

বাবা হযরত উমর (রা.)-কে দারুণ চিন্তায় ফেলে দেয়। তিনি তাঁর কন্যার জন্য একজন উপযুক্ত ও দ্বীনদার স্বামী খুঁজছিলেন।

এই ব্যাকুলতা থেকেই এক চমৎকার ঘটনার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হযরত হাফসা (রা.)-এর বিবাহের পথ সুগম হয়। বিস্তারিত ঘটনাটি নিচে তুলে ধরা হলো:

১. উমর (রা.)-এর পাত্র সন্ধান ও সাহাবিদের নীরবতা

হযরত উমর (রা.) তাঁর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে প্রথমে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেন।

- **হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে প্রস্তাব:** হযরত উমর (রা.) প্রথমে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর কাছে যান। (উল্লেখ্য, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা ও উসমান (রা.)-এর স্ত্রী হযরত রুকাইয়্যাহ সবেমাত্র ইন্তেকাল করেছেন)। উমর (রা.) তাঁকে বললেন, *"তুমি চাইলে আমার মেয়ে হাফসাকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে পারি।"* উসমান (রা.) কিছুটা সময় চাইলেন এবং কয়েকদিন পর বিনয়ের সাথে বললেন, *"আমি এই মুহূর্তে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"*
- **হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে প্রস্তাব:** উসমানের কথায় কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়ে উমর (রা.) তাঁর অপর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং একই প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু আবু বকর (রা.) প্রস্তাবটি শুনে পুরোপুরি নীরব রইলেন, কোনো উত্তরই দিলেন না। এতে উমর (রা.) আরও বেশি কষ্ট পেলেন এবং বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হলেন।

২. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উমরের ক্ষোভ প্রকাশ

হতাশ এবং দুঃখিত হয়ে হযরত উমর (রা.) সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির হলেন এবং উসমান ও আবু বকর (রা.)-এর আচরণের কথা খুলে বললেন। সব শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) মৃদু হাসলেন। তিনি উমর (রা.)-এর দুঃখ দূর করার জন্য এক ঐতিহাসিক ও অলৌকিক বাণী শোনালেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন:

"উমর! হাফসার কপালে উসমানের চেয়ে উত্তম স্বামী রয়েছে, আর উসমানের কপালে হাফসার চেয়ে উত্তম স্ত্রী রয়েছে।"

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই কথার অর্থ ছিল গভীর। তিনি নিজেই হাফসাকে বিয়ে করার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন (যিনি উসমানের চেয়ে উত্তম), আর তাঁর নিজের অন্য কন্যা উম্মু

কুলসুমকে উসমানের সাথে বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন (যিনি হাফসার চেয়ে উত্তম)।

৩. আবু বকর (রা.)-এর নীরবতার রহস্য উন্মোচন

রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন নিজে হযরত হাফসাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন, তখন হযরত উমর (রা.)-এর আনন্দের আর সীমা রইল না। বিয়ের সব ঠিক হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) উমরের সাথে দেখা করে তাঁর নীরবতার কারণ ব্যাখ্যা করলেন।

আবু বকর (রা.) বললেন, *"হে উমর! যখন তুমি আমার কাছে হাফসার প্রস্তাব এনেছিলে এবং আমি চুপ ছিলাম, তখন হয়তো তুমি আমার ওপর কষ্ট পেয়েছিলে? আসলে আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে হাফসাকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। রাসুলের এই গোপন ইচ্ছাটি আমি নিজ মুখে প্রকাশ করতে পারছিলাম না বলেই তখন চুপ ছিলাম। যদি রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বিয়ে না করতেন, তবে আমি অবশ্যই তোমার প্রস্তাব লুফে নিতাম।"* আবু বকর (রা.)-এর এই কথায় উমর (রা.)-এর মনের সব ক্ষোভ দূর হয়ে যায়।

৪. শুভ বিবাহ সম্পন্ন (৩য় হিজরি)

হিজরি তৃতীয় সনের শাবান মাসে (ওহুদ যুদ্ধের ঠিক কিছুকাল আগে) রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত হাফসা (রা.)-এর এই পবিত্র বিবাহ সম্পন্ন হয়। মোহরানা হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে ৪০০ দিরহাম প্রদান করেছিলেন।

এই বিয়ের মাধ্যমে হযরত হাফসা (রা.) ইসলামের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ আসন "উম্মুল মুমিনীন" (মুমিনদের জননী) লাভ করেন। একই সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হযরত উমর (রা.)-এর পারিবারিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক আরও মজবুত হয়, ঠিক যেভাবে হযরত আয়েশাকে বিয়ের মাধ্যমে হযরত আবু বকরের সাথে সম্পর্ক গভীর হয়েছিল।

একটি সুন্দর অধ্যায়ের সূচনা:

হযরত হাফসা (রা.) রাসুলের ঘরে প্রবেশ করার পর হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে তাঁর গভীর সখ্যতা ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। রাসুলের স্ত্রীদের মধ্যে তাঁরা দুজন ছিলেন মদিনার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ জুটি, যাঁরা একে অপরের সুখ-দুঃখে সবসময় পাশে থাকতেন।

স্ত্রী হিসেবে কেমন ছিলেন হাফসা (রা.)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী হিসেবে হযরত হাফসা (রা.) ছিলেন একাধারে অত্যন্ত দ্বীনদার, ইবাদতগুজার এবং আত্মমর্যাদাশীল এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর মাঝে যেমন ছিল গভীর ধর্মীয় নিষ্ঠা, তেমনই ছিল তাঁর বাবা হযরত উমর (রা.)-এর মতো স্পষ্টভাষিতা ও সাহসিকতা। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. অত্যন্ত ইবাদতগুজার ও পরহেজগার

হযরত হাফসা (রা.) তাঁর দিন-রাতের সিংহভাগ সময় ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে নফল রোজা রাখতেন এবং গভীর রাতে দীর্ঘসময় নফল নামাজ (তাহাজ্জুদ) পড়তেন।

একবার বিশেষ এক পারিবারিক কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে একটি 'তালাক' (তালাকে রাজয়ী বা সাময়িক প্রত্যাহারযোগ্য তালাক) দিয়েছিলেন। তখন স্বয়ং জিবরাইল (আ.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ওহী নিয়ে আসেন এবং হাফসা (রা.)-কে ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

"আপনি হাফসাকে ফিরিয়ে নিন। কারণ তিনি একজন অত্যন্ত রোজা পালনকারী (সাউয়ামাহ) এবং সারারাত নামাজে দাঁড়িয়ে থাকা নারী (কাওয়ামাহ)। আর জান্নাতেও তিনি আপনার স্ত্রী।"

স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ইবাদতের এই স্বীকৃতি তাঁর মহান মর্যাদার প্রমাণ দেয়।

২. আয়েশা (রা.)-এর সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও জুটি

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরে প্রবেশ করার পর হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে হাফসা (রা.)-এর এক চমৎকার ও গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বয়সের দিক থেকে কাছাকাছি হওয়ায় এবং দুজনের বাবার (আবু বকর ও উমর) মধ্যকার গভীর সম্পর্কের কারণে তাঁরা দুজন ছিলেন রাসুলের ঘরের সবচেয়ে শক্তিশালী জুটি।

হযরত আয়েশা (রা.) নিজেই বলতেন, *"রাসুলের স্ত্রীদের মধ্যে হাফসা ছাড়া আর কেউ আমার সমকক্ষ হওয়ার সাহস দেখাত না।"* তাঁরা ঘরের যেকোনো বিষয়ে একে অপরের সাথে পরামর্শ করতেন এবং সুখে-দুঃখে পাশে থাকতেন।

৩. স্পষ্টভাষী ও আত্মমর্যাদাশীল

বাবার রক্ত তাঁর ধমনিতে বইছিল, তাই হযরত হাফসা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনেও তিনি নিজের মতামত বা অধিকারের কথা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতেন। তৎকালীন আরব সমাজের নারীদের তুলনায় তিনি বেশ প্রগতিশীল ও সাহসী ছিলেন।

হাদিসে এসেছে, একবার হযরত উমর (রা.) তাঁর স্ত্রীর সাথে কোনো বিষয়ে তর্ক করছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী উমরকে পাল্টা জবাব দেন। উমর (রা.) রেগে গেলে তাঁর স্ত্রী বলেন, *"আপনি অবাক হচ্ছেন কেন? আল্লাহর রাসুলের স্ত্রীরাও তো তাঁর কথার পাল্টা জবাব দেন, এমনকি কখনো কখনো তাঁরা সারা দিন রাসুলের সাথে কথা না বলে (অভিমান করে) থাকেন!"* উমর (রা.) এতে চিন্তিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে হাফসার ঘরে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, *"মা! তোমরা কি সত্যিই রাসুলের সাথে এমন করো?"* হাফসা (রা.) অকপটে স্বীকার করে বলেন, *"হ্যাঁ, আমরা এমন করি।"* উমর তখন তাঁকে রাসুলের প্রতি আরও বিনয়ী ও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেন।

৪. জ্ঞান অন্বেষণ ও সুন্নাহর প্রতি অনুগত

স্ত্রী হিসেবে তিনি কেবল ঘরের কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে তিনি প্রতিনিয়ত দ্বীনের জ্ঞান ও বিভিন্ন মাসআলা শিখে নিতেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রায় **৬০টি হাদিস** বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। রাসুলের সামান্যতম অসন্তুষ্টিও তাঁকে ভীষণভাবে ব্যথিত করত।

৫. সাধারণ জীবনযাপন ও ধৈর্য

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরে অত্যন্ত অভাব-অনটন ছিল। অনেক সময় টানা কয়েকদিন শুধু খেজুর আর পানি খেয়ে থাকতে হতো। হযরত হাফসা (রা.) এই দারিদ্র্য ও কষ্ট অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং কখনো অনাড়ম্বর জীবন নিয়ে কোনো অভিযোগ করেননি।

সংক্ষেপে:

স্ত্রী হিসেবে হযরত হাফসা (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য এক অত্যন্ত বিশ্বস্ত, পরহেজগার এবং জান্নাতি সঙ্গী। তাঁর স্পষ্টভাষিতা ও গভীর ইবাদতের সংমিশ্রণ তাঁকে উম্মাহাতুল মুমিনীনের মাঝে এক অনন্য ও স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে বসিয়েছে।

রাসুল(সা.) এর প্রতি হাফসা (রা.)ভালোবাসা

হযরত হাফসা (রা.)-এর অন্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি যে ভালোবাসা ছিল, তা ছিল অত্যন্ত গভীর, আবেগপূর্ণ এবং শ্রদ্ধায় ঘেরা। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামান্যতম বিরহ বা অসন্তুষ্টিও তাঁকে ভীষণভাবে ব্যাকুল করে তুলত।

রাসুলের প্রতি তাঁর সেই গভীর ভালোবাসার কিছু সুন্দর ও উল্লেখযোগ্য দিক নিচে তুলে ধরা হলো:

১. রাসুলের অসন্তুষ্টিতে চরম ব্যাকুলতা

হযরত হাফসা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে কতটা ভালোবাসতেন, তা বোঝা যায় তাঁর একটি ভুলের ঘটনার মাধ্যমে। একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর অন্য এক স্ত্রীর ঘরে মধু পান করেছিলেন। হযরত হাফসা ও হযরত আয়েশা (রা.) মিলে একটি ছোট কৌশল করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন তাঁদের ঘরে আসবেন, তখন তাঁরা বলবেন যে রাসুলের মুখ থেকে এক ধরনের বিশেষ গাছের (ماغافير - মাগাফির) গন্ধ আসছে (রাসুলুল্লাহ সা. সুগন্ধি খুব পছন্দ করতেন এবং দুর্গন্ধ একদম সহ্য করতে পারতেন না)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এতে কষ্ট পেয়ে নিজেকে আর কখনো মধু না খাওয়ার কসম করেন। তখন মহান আল্লাহ সূরা আত-তাহরীমের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাজিল করে রাসুলকে এই কসম ভাঙার নির্দেশ দেন এবং স্ত্রীদের সতর্ক করেন। এই ঘটনার পর হযরত হাফসা (রা.) এতটাই অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর ভয়ে ও রাসুলের ভালোবাসায় এত বেশি কেঁদেছিলেন যে, তিনি জীবনের বাকি সময় রাসুলকে কষ্ট দেওয়ার মতো কোনো কাজের কথা কল্পনাও করেননি।

২. তালাকের খবরে গভীর শোক ও কান্না

পারিবারিক এক অভিমানের কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন হযরত হাফসা (রা.)-কে একটি 'তালাক' (সাময়িক প্রত্যাহারযোগ্য তালাক) দিয়েছিলেন এবং স্ত্রীদের থেকে আলাদা হয়ে একটি ছোট কক্ষে অবস্থান করছিলেন, তখন মদিনায় রটে যায় যে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সব স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন।

হযরত উমর (রা.) খবর পেয়ে দ্রুত মেয়ে হাফসার ঘরে যান। তিনি দেখেন, হাফসা (রা.) ঘরের কোণে বসে অঝোরে কাঁদছেন। উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, *"তুমি কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে আগেই সতর্ক করিনি?"* হাফসা (রা.) কাঁদতে কাঁদতে বললেন, *"আল্লাহর কসম, আমি আমার তালাকের চেয়েও বেশি কাঁদছি এই ভেবে যে— রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।"* রাসুলের

প্রতি এই ভালোবাসার কারণেই পরবর্তীতে স্বয়ং জিবরাইল (আ.) এসে রাসুলকে বলেন, *"হাফসাকে ফিরিয়ে নিন, কারণ তিনি জান্নাতেও আপনার স্ত্রী।"*

৩. রাসুলের পছন্দ-অপছন্দের প্রতি গভীর খেয়াল

হযরত হাফসা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আরাম ও অভ্যাসের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) রাতের বেলা কীভাবে ঘুমাতে পছন্দ করেন, কোন কাপড়ে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তা তিনি খুব ভালো জানতেন।

এক রাতে হযরত হাফসা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শোয়ার নরম চটটি (বিছানা) চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দেন যাতে রাসুল একটু বেশি আরাম পান। পরদিন সকালে রাসুলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, *"রাতে আমার নিচে কী বিছানো হয়েছিল?"* হাফসা (রা.) বললেন, *"আপনার সেই চটটিই আমি চার ভাঁজ করে দিয়েছিলাম।"* রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, *"এটিকে আগের মতো দুই ভাঁজ করেই বিছিয়ে দিও, কারণ এর অতিরিক্ত নরম ভাব রাতে আমাকে তাহাজ্জুদের নামাজে উঠতে কিছুটা বিলম্ব করিয়ে দিয়েছিল।"* রাসুলের এই নির্দেশের পর হাফসা (রা.) সবসময় খেয়াল রাখতেন যেন রাসুলের ইবাদতে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে।

৪. সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসরণ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার অন্যতম বড় বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর সুন্নাত বা নিয়মের প্রতি হাফসা (রা.)-এর আনুগত্যে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘরোয়া জীবনে কীভাবে ওজু করতেন, কীভাবে নামাজ পড়তেন, ঘুমানোর আগে কী দোয়া পড়তেন—এসব কিছু হাফসা (রা.) খুব নিখুঁতভাবে মুখস্থ রাখতেন এবং নিজের জীবনে তা হুবহু আমল করতেন। কেউ রাসুলের কোনো অভ্যাস সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি অত্যন্ত আবেগ ও ভালোবাসার সাথে তা বর্ণনা করতেন।

৫. ওফাতের পর আমরণ বিরহ বেদনা

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত হাফসা (রা.)-এর জীবন পুরোপুরি বদলে যায়। রাসুলের চলে যাওয়ার শোক তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। তিনি দুনিয়ার সমস্ত ভোগ-বিলাস এবং সাজগোজ পুরোপুরি বর্জন করেন। রাসুলের প্রতি ভালোবাসার টানেই তিনি জীবনের বাকি সময়টা শুধু নফল রোজা, দীর্ঘ তাহাজ্জুদ এবং কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কাটিয়ে দেন, যেন পরকালে জান্নাতে আবার তাঁর প্রিয়তম স্বামীর সাথে মিলিত হতে পারেন।

ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার:

হযরত হাফসা (রা.)-এর এই অকৃত্রিম ভালোবাসার সবচেয়ে বড় প্রতিদান ছিল স্বয়ং আল্লাহর বাণী, যেখানে তাঁকে **"জান্নাতেও রাসুলের স্ত্রী"** হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য ও ভালোবাসার স্বীকৃতি আর কী হতে পারে!

হাফসা(রা.) এর ইন্তেকাল

হযরত হাফসা (রা.)-এর ইন্তেকাল বা মৃত্যুর ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত শান্ত, ইবাদতপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি প্রায় ৩৩ বছর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি মদিনায় অত্যন্ত সাধারণ ও পর্দানশীন জীবনযাপন করেন।

অবশেষে **৪৫ হিজরি সনের شعبان (শাবান) মাসে** (কারো মতে জুমাদাল উলা মাসে) মদিনা মুনাওয়ারায় এই মহান নারী ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৬০ বছর।

তাঁর ইন্তেকাল, অসিয়ত এবং দাফনের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. মৃত্যুর আগের দিনগুলো ও অসিয়ত পালন

হযরত হাফসা (রা.) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতেও অত্যন্ত কঠোরভাবে রোজা ও তাহাজ্জুদের আমল জারি রেখেছিলেন। এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি রোজা অবস্থায় ছিলেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে ডেকে একটি বিশেষ অসিয়ত করেন। তাঁদের পিতা খলিফা হযরত উমর (রা.) শাহাদাতের আগে খায়বরের একটি মূল্যবান জমি (যা 'গাবাহ' নামে পরিচিত ছিল) থেকে অর্জিত লভ্যাংশ গরিব-দুঃখীদের মাঝে দান করার জন্য হাফসা (রা.)-কে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। হাফসা (রা.) মৃত্যুর আগে তাঁর ভাই আবদুল্লাহ (রা.)-কে ডেকে বলেন, *"হে ভাই! পিতা উমর আমাদের ওপর সদকার যে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন, আমার মৃত্যুর পর তুমি যেন তা একইভাবে জারি রাখো এবং গরিবদের হক বুঝিয়ে দাও।"*

২. ইন্তেকালের মুহূর্ত

শাবান মাসের এক শান্ত দিনে, মহান আল্লাহর জিকির এবং ইবাদতরত অবস্থায় হযরত হাফসা (রা.) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ মদিনায় ছড়িয়ে পড়লে পুরো মদিনাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবিত স্ত্রীদের মধ্যে

অন্যতম এবং খলিফা উমরের কন্যা হওয়ার কারণে মদিনার মানুষের কাছে তাঁর এক আলাদা সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল।

৩. জানাজা এবং দাফন

হযরত হাফসা (রা.)-এর জানাজা ও দাফনের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত মর্যাদার সাথে সম্পন্ন হয়েছিল:

- **জানাজার ইমামতি:** মদিনার তৎকালীন গভর্নর এবং প্রখ্যাত সাহাবি **হযরত মারওয়ান ইবনুল হাকাম** তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান।
- **মর্যাদাপূর্ণ কাফন ও জানাজা:** তাঁর জানাজায় মদিনার অগণিত সাহাবি, তাবেয়ি এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারের (আহলে বাইত) সদস্যরা অংশ নেন। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী নারীদের যেভাবে খাটিয়া ঢেকে নেওয়া হতো, অত্যন্ত পর্দার সাথে তাঁর মরদেহ বহনের ব্যবস্থা করা হয়।

কবরে নামানো: মদিনার বিখ্যাত এবং পবিত্র কবরস্থান **'জান্নাতুল বাকি'**-তে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁকে কবরে নামানোর দায়িত্ব পালন করেন তাঁর ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এবং ভাইয়ের ছেলেরা (আসিম, আবদুল্লাহ, হামজা ও বিলাল)। জান্নাতুল বাকিতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীগণের (উম্মাহাতুল মুমিনীন) পাশেই তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

একটি ঐতিহাসিক অবদান:

হযরত হাফসা (রা.)-এর ইন্তেকালের সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাসের এক বিশাল আমানতদারীর অধ্যায় শেষ হয়। আবু বকর (রা.)-এর আমলে সংকলিত এবং উমর (রা.)-এর সূত্রে প্রাপ্ত **কুরআনের মূল লিখিত পাণ্ডুলিপিটি (সহিফা)** হযরত হাফসা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে নিজের হেফাজতে রেখেছিলেন। পরবর্তীতে এই পাণ্ডুলিপি থেকেই খলিফা উসমান (রা.) কুরআনের কপি তৈরি করে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি তাঁর জ্ঞান, আমানতদারী এবং গভীর ইবাদতের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর কাছে "উম্মুল মুমিনীন" হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে থাকবেন।

হযরত জয়নব বিনতে খুজাইমা (রা.)

উম্মুল মুমিনীন **হযরত যায়নাব বিন্তে খুজাইমা (রা.)** ইসলামের ইতিহাসে তাঁর মহানুভবতা ও দানশীলতার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁর দানশীলতার কারণে তাঁকে **"উম্মুল মাসাকীন"** বা "মিসকিনদের মা" উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

তাঁর জন্ম ও শৈশবকালীন জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত ঐতিহাসিক তথ্য নিচে তুলে ধরা হলো:

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত যায়নাব (রা.)-এর সঠিক জন্মসাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা ভিন্নমত রয়েছে। তবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের মতে, তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির আনুমানিক **১৩ থেকে ১৫ বছর পূর্বে** (প্রায় ৫৯৫-৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি কুরাইশ বংশের একটি নামকরা শাখায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

- **পিতা:** খুজাইমা ইবনে হারিস। তিনি আরবের বনু আমির ইবনে সা'সা'আ গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।
- **মাতা:** হিন্দ বিন্তে আউফ। আরবের ইতিহাসে হিন্দ বিন্তে আউফকে "আরবের সবচেয়ে সম্মানিত শাশুড়ি" বলা হয়, কারণ তাঁর কন্যারা (যায়নাব, ময়মূনা, আসমা) মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতো মহান ব্যক্তিদের স্ত্রী ছিলেন।

শৈশব ও কৈশোরকাল

যায়নাব বিন্তে খুজাইমা (রা.) আরবের জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগে বেড়ে উঠলেও তাঁর শৈশব ও কৈশোর ছিল অন্যান্য সাধারণ মেয়েদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

- **মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ:** তিনি একটি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং কুলীন পরিবারে বড় হন, যার ফলে শৈশব থেকেই তিনি উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং শিষ্টাচার শেখার সুযোগ পান।
- **উদার মনস্তত্ত্ব:** ছোটবেলা থেকেই তাঁর মন ছিল অত্যন্ত কোমল ও দয়াশীল। মক্কার তৎকালীন সমাজে যখন গরিব ও দাসদের অবহেলা করা হতো, তিনি তখন থেকেই অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়াতেন।

- **"উম্মুল মাসাকীন" উপাধি:** শৈশব ও কৈশোর পার করে যৌবনে পদার্পণের পর তাঁর এই দানশীলতা আরও ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। তিনি নিজের খাবার ও অর্থ গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। অভাবীদের প্রতি তাঁর এই অভূতপূর্ব ভালোবাসা ও আশ্রয়ের কারণে মক্কাবাসী ইসলামের আগমনপূর্ব যুগেই তাঁকে **"উম্মুল মাসাকীন" (মিসকিনদের মাতা)** বলে ডাকতে শুরু করে।

হযরত যায়নাব বিন্তে খুজাইমা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের অধ্যায়টি অত্যন্ত ত্যাগ ও বীরত্বে গাঁথা। তৎকালীন আরবের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থার মধ্যেও তিনি সত্যকে চিনে নিতে ভুল করেননি।

নিচে তাঁর প্রথম বিয়ে, দাম্পত্য জীবন এবং ইসলাম গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

প্রথম বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন

হযরত যায়নাব (রা.)-এর প্রথম বিয়ে নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দুটি প্রধান বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে উভয় বর্ণনাতেই তাঁর স্বামীরা ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত বীর যোদ্ধা ও সম্মানিত সাহাবী ছিলেন।

- **প্রথম মত (অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে):** তাঁর প্রথম বিয়ে হয় হযরত **তুফায়েল ইবনে হারিস (রা.)**-এর সাথে। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর ফুফাতো ভাই। কিন্তু কোনো কারণে তাঁদের এই সংসার বেশিদিন টেকেনি এবং তাঁদের মধ্যে ডিভোর্স (তালাক) হয়ে যায়।
- **দ্বিতীয় বিয়ে ও ওহুদের যুদ্ধ:** তুফায়েল (রা.)-এর সাথে বিচ্ছেদের পর যায়নাব (রা.)-এর বিয়ে হয় তাঁরই ভাই হযরত **উবায়দাহ ইবনে হারিস (রা.)**-এর সাথে। উবায়দুল্লাহ (রা.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের এক মহান বীর। বদরের যুদ্ধে (ইসলামের প্রথম প্রধান যুদ্ধ) তিনি কাফেরদের সাথে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হন এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পরবর্তীতে শাহাদাত বরণ করেন।
- **দ্বিতীয় মত:** কিছু ইতিহাসবিদের মতে, তাঁর প্রথম বিয়ে সরাসরি হযরত **আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.)**-এর সাথে হয়েছিল। তিনি ওহুদের যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।
- **মূল কথা:** মহানবী (সা.)-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে হযরত যায়নাব (রা.) একজন শহীদের স্ত্রী (বিধবা) ছিলেন। ওহুদ বা বদরের যুদ্ধে স্বামী হারিয়ে তিনি যখন সম্পূর্ণ একা ও অসহায় হয়ে পড়েন, তখন তাঁর এই

নিঃসঙ্গতা দূর করতে এবং তাঁর পূর্বের দানশীলতার সম্মান রক্ষার্থে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত যায়নাব বিন্তে খুজাইমা (রা.) ছিলেন ইসলামের একদম শুরুর দিকের অনুসারীদের একজন।

- **প্রাথমিক যুগেই সাড়া:** মক্কায় যখন মহানবী (সা.) গোপনে ও প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন, তখন যায়নাব (রা.) মক্কার কুসংস্কার ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন।
- **কঠিন পরীক্ষা:** তৎকালীন সময়ে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করা মানেই ছিল পরিবার ও সমাজের পক্ষ থেকে চরম নির্যাতন ও বয়কটের মুখোমুখি হওয়া। যায়নাব (রা.) এবং তাঁর পরিবার সেই সমস্ত কঠিন পরিস্থিতি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেন।
- **মদিনায় হিজরত:** মক্কার কাফেরদের অত্যাচার যখন চরম সীমায় পৌঁছায়, তখন আল্লাহর নির্দেশে তিনি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন। নিজের ঘরবাড়ি, চেনা পরিবেশ ত্যাগ করে মদিনার এক নতুন ও অপরিচিত পরিবেশে গিয়ে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যোগ দেন।

তাঁর জীবনের এই প্রাথমিক অধ্যায়টি প্রমাণ করে যে, তিনি কেবল দানশীলই ছিলেন না, বরং ঈমানের পরীক্ষায় অত্যন্ত দৃঢ় ও সাহসী একজন নারী ছিলেন।

রাসুল (সা.) এর সাথে বিয়ে

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হযরত যায়নাব বিন্তে খুজাইমা (রা.)-এর বিবাহের ঘটনাটি ছিল গভীর সহানুভূতি, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং এক মহান নারীর মর্যাদার স্বীকৃতির প্রতীক। এই বিবাহ কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না, বরং এর পেছনে ছিল ওহুদ যুদ্ধের এক বেদনাদায়ক প্রেক্ষাপট।

নিচে বিবাহের পুরো ঘটনাটি ধাপে ধাপে তুলে ধরা হলো:

১. বিবাহের পটভূমি ও অসহায়ত্ব

হযরত যায়নাব (রা.)-এর স্বামী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.) ওহুদের যুদ্ধে (৩য় হিজরি) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন। স্বামী হারিয়ে যায়নাব (রা.) মদিনার সমাজে সম্পূর্ণ একা ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। তৎকালীন আরবের সমাজব্যবস্থায় একজন বিধবা নারীর জন্য একাকী জীবনযাপন করা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও নিরাপত্তাহীন। তা ছাড়া, তিনি মদিনার আনসার (স্থানীয় বাসিন্দা) ছিলেন না, ছিলেন মক্কা থেকে আসা একজন মুহাজির (অভিবাসী), যার ফলে সেখানে তাঁর নিজস্ব কোনো বড় পারিবারিক আশ্রয় ছিল না।

২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব

যায়নাব বিন্তে খুজাইমা (রা.) আগে থেকেই তাঁর অসামান্য দানশীলতা ও মহৎ চরিত্রের জন্য মদিনাবাসীর কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তিনি নিজে অভাবী হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের সাহায্য করতেন, যার কারণে সবাই তাঁকে "উম্মুল মাসাকীন" (মিসকিনদের মা) বলে ডাকত।

একদিকে একজন বীর শহীদের বিধবা স্ত্রীর অসহায়ত্ব, অন্যদিকে তাঁর এই অনন্য পবিত্র চরিত্র—সব মিলিয়ে মহানবী (সা.) তাঁর প্রতি গভীর সহানুভূতি অনুভব করেন। তিনি চাইলেন এই মহীয়সী নারীকে সামাজিক নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে। তাই ওহুদ যুদ্ধের মাত্র কয়েক মাস পর, ৩য় হিজরির রমজান বা শাওয়াল মাসে মহানবী (সা.) নিজেই হযরত যায়নাব (রা.)-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান।

৩. বিবাহ সম্পন্ন ও মোহরানা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতো একজন মহান মানুষের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাওয়া ছিল অত্যন্ত সৌভাগ্যের। হযরত যায়নাব (রা.) অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

- **উকিল বা অভিভাবক:** হযরত যায়নাব (রা.)-এর পক্ষে তাঁর নিকটাত্মীয় (মতান্তরে তাঁর ভাই) কাবিসা ইবনে আমর আল-হিলালি এই বিয়ের আকদ বা অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করেন।
- **মোহরানা:** রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে **৪০০ দিরহাম** (মতান্তরে সাড়ে বারো উ৳ ৯ সোনা) মোহরানা প্রদান করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

বিবাহের পর মহানবী (সা.) তাঁর থাকার জন্য মদিনার মসজিদে নববীর পাশে একটি পৃথক কক্ষ (হুজরা) তৈরি করে দেন এবং তিনি উম্মুল মুমিনীন (বিশ্বাসীদের মা) হিসেবে রাসূল (সা.)-এর ঘরে প্রবেশ করেন।

এই বিবাহের মূল শিক্ষা ও তাৎপর্য

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অধিকাংশ বিবাহের পেছনেই গভীর রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় কারণ থাকত। হযরত যায়নাব (রা.)-এর সাথে এই বিবাহের মূল কারণগুলো ছিল:

- **শহীদের পরিবারের সম্মান রক্ষা:** ওহুদ যুদ্ধে যে সমস্ত সাহাবীরা শাহাদাত বরণ করেছিলেন, তাঁদের পরিবারের দেখাশোনা করা এবং সমাজকে এটা বোঝানো যে—ইসলাম শহীদদের পরিবারকে কখনো অবহেলা করে না।
- **দানশীলতার স্বীকৃতি:** মক্কার তৎকালীন ধনী পরিবারগুলো যখন গরিবদের অবজ্ঞা করত, তখন যায়নাব (রা.) নিজের সব বিলিয়ে দিতেন। রাসূল (সা.) তাঁকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর দরবারে এই ত্যাগ ও উদারতার মূল্য কতখানি।

হযরত জয়নাব (রা.) এর ইন্তেকাল

হযরত যায়নাব বিন্তে খুজাইমা (রা.)-এর বৈবাহিক জীবন ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যিনি মহানবী (সা.)-এর জীবিতাবস্থায় ইন্তেকাল করেছিলেন (কেবল প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.) ছাড়া)।

তাঁর ইন্তেকাল, জানাজা ও দাফনের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

বিয়ের কতদিন পর ইন্তেকাল করেন?

হযরত যায়নাব (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে বিয়ের মাত্র **২ থেকে ৩ মাস** (মতান্তরে ৮ মাস) পর ইন্তেকাল করেন।

তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরে আসেন, তখন তাঁর বয়স ছিল আনুমানিক ৩০ বছর। অত্যন্ত অল্প বয়সে এবং বিয়ের মাত্র কয়েক মাসের মাথায় ৩য় হিজরির শেষভাগে বা ৪র্থ হিজরির শুরুর দিকে (সম্ভবত রবিউস সানি মাসে) তিনি মদিনায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং মদিনার মুসলিম সমাজ গভীর শোকাহত হয়ে পড়েছিল।

জানাজা ও দাফন

হযরত যায়নাব (রা.)-এর জানাজা ও দাফনের বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশেষ মর্যাদা বহন করে:

- **রাসূল (সা.) নিজেই জানাজা পড়ান:** উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব (রা.)-এর জানাজার নামাজ স্বয়ং **রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে ইমামতি করে পড়িয়েছিলেন**। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই প্রথম, যাঁর জানাজার নামাজ মহানবী (সা.) নিজে পড়িয়েছেন (কারণ হযরত খাদিজা (রা.) যখন মক্কায় ইন্তেকাল করেন, তখনো ইসলামের শরিয়তে জানাজার নামাজ ফরজ বা প্রচলিত হয়নি)।
- **দাফন:** জানাজা শেষে তাঁকে মদিনার বিখ্যাত কবরস্থান **জান্নাতুল বাকি**-তে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে তাঁর মরদেহ কবরে নামানোর জন্য ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন এবং অত্যন্ত যত্নের সাথে তাঁকে দাফন করেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনের এক মহান অধ্যায়

যদিও মহানবী (সা.)-এর সাথে উম্মুল মুমিনীন হিসেবে তাঁর সময়কাল ছিল খুবই অল্প, তবুও তিনি মদিনার দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর থাকার ঘরটি (হুজরা) শূন্য হয়ে পড়েছিল, যা পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরবর্তী স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে দেওয়া হয়েছিল।

শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত উম্মুল মাসাকীন বা "মিসকিনদের মা" হিসেবে তিনি যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তা ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

হযরত উম্মে সালামা (হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়্যা) (রা.)

হযরত উম্মে সালামা (রা.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তিত্ব এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে (উম্মাহাতুল মুমিনিন) অন্যতম। তাঁর জন্ম ও শৈশবকাল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

জন্ম ও বংশ পরিচয়

- **জন্ম:** হযরত উম্মে সালামা (রা.) আনুমানিক ৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত ও প্রভাবশালী **কুরাইশ বংশের বনু মাখজুম** শাখায় জন্মগ্রহণ করেন।
- **আসল নাম:** তাঁর আসল নাম ছিল **হিন্দ**। তবে তিনি তাঁর বড় ছেলে "সালামা" এর নামানুসারে "উম্মে সালামা" (সালামার মা) উপনামে (কুনিয়াত) বেশি পরিচিতি লাভ করেন।
- **পিতা:** তাঁর পিতা ছিলেন **আবু উমাইয়াহ ইবনে আল-মুগিরা**। তিনি মক্কার একজন অত্যন্ত ধনী, দয়ালু এবং প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। আরবে তিনি **"যাদুল রাকিব" (মুসাফিরের পাথেয়)** উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, কারণ তিনি যখনই কোনো সফরে যেতেন, তখন তাঁর কাফেলার বা তাঁর সাথে থাকা সমস্ত সহযাত্রীর খরচের দায়িত্ব নিজেই বহন করতেন।
- **মাতা:** তাঁর মাতা ছিলেন আতিকা বিনতে আমির, যিনি কুরাইশ বংশের বনু ফিনান শাখার সন্তান ছিলেন।

শৈশব ও লালন-পালন

- **উচ্চবংশীয় মর্যাদা:** বনু মাখজুম বংশটি কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও সম্পদশালী ছিল (এই বংশেরই সন্তান ছিলেন আবু জাহেল এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ)। ফলে উম্মে সালামা (রা.) অত্যন্ত বিলাসবহুল, সুরক্ষিত এবং মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে বেড়ে ওঠেন।
- **মেধা ও শিক্ষা:** শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং ধীরস্থির স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তৎকালীন আরবের নারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম রূপবতী ও বিদূষী হিসেবে পরিগণিত হতেন। তাঁর এই শৈশবের মার্জিত শিক্ষা ও মানসিক গঠন পরবর্তীতে ইসলামের ইতিহাসে তাঁর বড় বড় সিদ্ধান্ত ও অবদানের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল।

সংক্ষিপ্ত তথ্য: হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর শৈশব কেটেছে মক্কার সবচেয়ে অভিজাত ও ধনী পরিবারের আদরে। কিন্তু পরবর্তীতে সত্যের সন্ধানে তিনি সব ধরনের বিলাসিতা ত্যাগ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন।

ইসলাম গ্রহণ :

হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং তাঁর প্রথম স্বামীর সাথে কাটানো জীবন ইসলামের ইতিহাসের এক আবেগঘন ও ত্যাগের অধ্যায়। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

প্রথম স্বামী: হযরত আবু সালামা (রা.)

হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর প্রথম স্বামী ছিলেন **হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ (রা.)**, যিনি ইতিহাসে **আবু সালামা** নামেই বেশি পরিচিত।

- **বংশীয় সম্পর্ক:** আবু সালামা (রা.) ছিলেন উম্মে সালামার আপন চাচাতো ভাই (উভয়েই বনু মাখজুম বংশের)।
- **রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক:** আবু সালামা (রা.) সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফাতো ভাই ছিলেন (রাসুলুল্লাহ সা.-এর ফুফু বাররাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিবের ছেলে)। একই সাথে তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দুধভাই (উভয়েই আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবার দুধ পান করেছিলেন)।

ইসলাম গ্রহণ

ইসলামের একদম শুরুর দিকে, যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কায় গোপনে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখনই এই দম্পতি ইসলামের আলোয় আলোকিত হন।

- **অগ্রগামীদের অন্যতম:** হযরত আবু সালামা (রা.) এবং উম্মে সালামা (রা.) প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণকারী মুষ্টিমেয় সাহাবিদের অন্যতম ছিলেন।
- **দারুল আরকামের পূর্বে:** ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী, রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের দ্বীনি শিক্ষার জন্য 'দারুল আরকাম' (আরকামের বাড়ি)-কে কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়ার আগেই এই দম্পতি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হিজরত ও অসীম ত্যাগের গল্প

ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের পক্ষ থেকে তাঁদের ওপর নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। এই দম্পতি দ্বীন রক্ষার জন্য দুই বার হিজরত করেন।

১. হাবশায় (আবিসিনিয়া) হিজরত:

মক্কার কাফেরদের অত্যাচার সইতে না পেরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমতিতে যে দলটি প্রথম হাবশায় হিজরত করেছিল, আবু সালামা ও উম্মে সালামা (রা.) সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেখানে কিছুদিন শান্তিতে থাকার পর মক্কার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে ভেবে তাঁরা আবার মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এসে দেখেন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ।

২. মদীনায় হিজরত ও হৃদয়বিদারক বিচ্ছেদ:

রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন সবাইকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন, তখন আবু সালামা (রা.) তাঁর স্ত্রী ও উটের পিঠে থাকা শিশুপুত্র সালামাকে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু উম্মে সালামার গোত্র (বনু মাখজুম)-এর লোকেরা তাঁদের পথরোধ করে এবং উম্মে সালামাকে জোরপূর্বক কেড়ে নেয়।

জবাবে আবু সালামার গোত্র (বনু আবদুল আসাদ)-এর লোকেরা এসে বলে, *"তোমরা উম্মে সালামাকে নিয়ে গেলে আমরা আমাদের বংশের সন্তান সালামাকে তোমাদের কাছে ছাড়ব না।"* এই টানাহেঁচড়ার মধ্যে শিশু সালামার হাত মচকে যায় এবং বাবার গোত্রের লোকেরা শিশুকে নিয়ে যায়। আর আবু সালামা (রা.) দ্বীন রক্ষার তাগিদে একা মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হতে বাধ্য হন।

এক বছরের কান্না: মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে একটি সুখী পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। স্বামী মদীনায়, সন্তান এক গোত্রে, আর উম্মে সালামা অবরুদ্ধ অন্য গোত্রে। হযরত উম্মে সালামা (রা.) টানা এক বছর প্রতিদিন মক্কার 'আবতাহ' উপত্যকায় গিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বামী ও সন্তানের বিরহে কাঁদতেন। পরবর্তীতে তাঁর এক আত্মীয়ের দয়ায় গোত্রের লোকদের মন গলে এবং তিনি সন্তানকে ফেরত পান ও একা মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন।

প্রথম স্বামীর ইন্তেকাল

মদনী জীবনে আবু সালামা (রা.) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে বদর ও ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

- ওহুদ যুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। দীর্ঘ চিকিৎসার পরও তাঁর সেই ক্ষত পুরোপুরি নিরাময় হয়নি।
- পরবর্তীতে হিজরি ৪ঠা জমাদিউল আউয়াল (কারও মতে শাওয়াল) মাসে তিনি এই ক্ষতের কারণেই শাহাদাত বরণ করেন।

একটি ঐতিহাসিক দোয়া:

স্বামী আবু সালামার মৃত্যুর পর উম্মে সালামা (রা.) শোকে ভেঙে পড়েন। তখন তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো একটি দোয়া পড়েন:

"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে সওয়াব দান করুন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন।"

উম্মে সালামা (রা.) নিজেই তখন মনে মনে ভাবতেন, আবু সালামার চেয়ে উত্তম স্বামী আর কে হতে পারে? কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর এই দোয়া কবুল করেছিলেন এবং পরবর্তীতে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বিয়ের মাধ্যমে তিনি "উম্মুল মুমিনিন" (বিশ্বাসী জননী)-এর মর্যাদা লাভ করেন।

রাসুল(সা.) সাথে বিয়ে সংসার

হযরত আবু সালামা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত উম্মে সালামা (রা.) চার সন্তান নিয়ে চরম একাকীত্ব ও কষ্টের মধ্যে পড়েন। মদীনার জীবনে তাঁর এই কঠিন সময়ে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিয়ের ঘটনা এবং পরবর্তী দাম্পত্য জীবন ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বিয়ের ঘটনা

আবু সালামা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর ইদ্দত (শোক পালনের নির্দিষ্ট সময়) শেষ হলে মদীনার শীর্ষ সাহাবিগণ তাঁর ও তাঁর সন্তানদের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠান।

- **সাহাবিদের প্রস্তাব:** প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.) এবং পরে হযরত উমর (রা.) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু সন্তানদের লালন-পালনের কথা চিন্তা করে এবং স্বামীর শোক কাটিয়ে উঠতে না পারায় তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।
- **রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রস্তাব:** এরপর স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত উমর (রা.)-এর মাধ্যমে উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান।
- **উম্মে সালামার দ্বিধা ও তিনটি অজুহাত:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রস্তাব পেয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করলেও অত্যন্ত সততা ও বিনয়ের সাথে নিজের তিনটি সমস্যার কথা জানান:

1. *"হে আল্লাহর রাসুল! আমি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল বা একটু ঈর্ষণীয় স্বভাবের নারী। আপনার অন্য স্ত্রীদের সাথে আমার আচরণে যদি কোনো ভুল হয়ে যায়, তবে আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় আছে।"*
2. *"আমি বয়সে কিছুটা বয়োবৃদ্ধ।"*
3. *"আমার ছোট ছোট সন্তান রয়েছে, যাদের লালন-পালনের দায়িত্ব আমার ওপর।"*

- **রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্দর সমাধান:** আল্লাহর রাসুল (সা.) তাঁর এই কথাগুলো শুনে অত্যন্ত চমৎকার ও স্নেহপূর্ণ উত্তর দিলেন:
    1. *"তোমার ঈর্ষণীয় স্বভাবের ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব যেন তিনি তা দূর করে দেন।"*
    2. *"বয়সের কথা বলছ? আমি নিজেও তো বয়োবৃদ্ধ (রাসুলুল্লাহ সা.-এর বয়স তখন প্রায় ৫৬-৫৭ বছর)।"*
    3. *"আর তোমার সন্তানেরা? তারা তো আমারও সন্তান। তাদের দায়িত্ব এখন থেকে আমার।"*

এই মহানুভবতার পর হযরত উম্মে সালামা (রা.) আর দ্বিমত করেননি। ৪ হিজরির শাওয়াল মাসে (কিছু বর্ণনা মতে জিলকদ মাসে) অত্যন্ত সাদামাটাভাবে তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্বপ্রয়াত স্ত্রী হযরত জয়নব বিনতে খুজায়মা (রা.)-এর হুজরায় (ঘরে) বাসস্থান পান।

দাম্পত্য জীবন ও সংসার (সংসারিক জীবন)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরে উম্মে সালামা (রা.)-এর সংসার জীবন ছিল অত্যন্ত সুখী, মর্যাদাপূর্ণ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে ভরপুর।

১. সন্তানদের পিতৃস্নেহ দান

রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মে সালামার সন্তানদের (সালামা, উমর, জয়নব ও দুররাহ) নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন। উম্মে সালামার পুত্র হযরত উমর ইবনে আবু সালামা (রা.) পরবর্তীতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরেই বড় হয়েছেন এবং খাবার টেবিলে রাসুল (সা.) তাঁকে পরম স্নেহে খাওয়ার আদব কায়দা শিখাতেন।

২. বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ উপদেষ্টা

উম্মে সালামা (রা.) শুধু একজন স্ত্রীই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন নারী। কঠিন পরিস্থিতিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর পরামর্শ নিতেন।

- **হুদায়বিয়ার সন্ধির ঐতিহাসিক ঘটনা:** হুদায়বিয়ার সন্ধির চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের কুরবানি করতে এবং মাথা মুণ্ডন করতে বলেন। কিন্তু চুক্তির শর্ত দেখে সাহাবিরা এতটাই মর্মাহত ছিলেন যে, তারা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন এবং তিনবার বলার পরও কেউ উঠলেন না। রাসুল (সা.) চিন্তিত হয়ে তাঁবুতে উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি বললেন।
- উম্মে সালামা (রা.) তখন এক যুগান্তকারী পরামর্শ দিয়ে বললেন, *"হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কাউকে কিছু না বলে নিজে বাইরে যান এবং আপনার কুরবানি জবাই করে মাথা মুণ্ডন করে ফেলুন।"* রাসুল (সা.) ঠিক তা-ই করলেন। রাসুল (সা.)-কে তা করতে দেখে সাহাবিরাও দ্রুত উঠে নিজেদের কুরবানি ও মাথা মুণ্ডন সম্পন্ন করলেন। তাঁর এই বুদ্ধিমত্তার কারণে সেদিনের এক বড় ফিতনা বা অবাধ্যতা থেকে সাহাবিরা বেঁচে যান।

৩. জ্ঞানচর্চা ও হাদিস বর্ণনা

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সংসার জীবনে উম্মে সালামা (রা.) ইসলামের বিধিবিধান খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। আয়েশা (রা.)-এর পর উম্মাহাতুল মুমিনিনদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে প্রায় **৩৭৮টি** হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মদীনার বহু বড় বড় সাহাবি ও তাবেয়ি জটিল মাসআলা-মাসায়েলের সমাধানের জন্য তাঁর হুজরায় আসতেন।

হযরত উম্মে সালামা (রা.)এর ইন্তেকাল

হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর ইন্তেকাল বা মৃত্যুর ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং এটি ইসলামের ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে ঘটেছিল। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীদের (উম্মাহাতুল মুমিনিন) মধ্যে **সর্বশেষ জীবিত স্ত্রী**। তাঁর ইন্তেকালের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. কারবালার মর্মান্তিক শোক ও অসুস্থতা

হযরত উম্মে সালামা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আহলে বাইত বা পরিবারকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। বিশেষ করে হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.)-কে তিনি নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন।

হিজরি ৬১ সনে (৬৮০ খ্রিস্টাব্দ) যখন ইরাকের কারবালা প্রান্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত হোসাইন (রা.) তাঁর পরিবারসহ অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ হন,

তখন এই খবর মদীনায় উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে পৌঁছায়। বৃদ্ধ বয়সে এই ভয়ংকর ও হৃদয়বিদারক সংবাদ তিনি সহ্য করতে পারেননি। প্রিয় নবীজির পরিবারের এই নির্মম পরিণতি দেখে তিনি তীব্র শোকে ভেঙে পড়েন এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে যান। ঐতিহাসিকদের মতে, এই গভীর মানসিক আঘাত ও শোকের কারণেই তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন, যা পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়।

২. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দেওয়া সেই অলৌকিক মাটি

হাদিস ও ইতিহাসের কিতাবে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় উম্মে সালামা (রা.)-কে একটি পাত্রে কিছুটা মাটি দিয়ে বলেছিলেন, *"যখন এই মাটি রক্তে পরিণত হবে, তখন বুঝে নিও আমার সন্তান হোসাইন শহীদ হয়েছে।"*

উম্মে সালামা (রা.) সেই মাটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছিলেন। কারবালার ঘটনার দিন (১০ই মহররম) তিনি স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে মলিন মুখে এবং মাথায় ধূলোবালি মাখা অবস্থায় দেখেন। রাসুল (সা.) স্বপ্নে তাঁকে বলেন যে, তিনি এইমাত্র হোসাইনের শাহাদাতের স্থান থেকে ফিরলেন। উম্মে সালামা (রা.) ধড়ফড় করে ঘুম থেকে উঠে সেই মাটির পাত্রটি দেখেন এবং দেখতে পান যে পাত্রের মাটি তাজা রক্তে পরিণত হয়েছে। তিনি তখন চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন এবং মদীণাবাসী বুঝতে পারে যে ইরাকে বড় কোনো বিপর্যয় ঘটে গেছে।

৩. ইন্তেকালের সময় ও বয়স

কারবালার এই শোকাবহ ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

- **সাল:** অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকের মতে, তিনি **৬১ হিজরির জিলকদ বা জিলহজ মাসে** ইন্তেকাল করেন। (কিছু বর্ণনায় ৫৯ বা ৬২ হিজরির কথাও এসেছে, তবে ৬১ হিজরিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য)।

বয়স: ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক **৮৪ থেকে ৮৮ বছরের** মধ্যে।

৪. জানাজা ও দাফন

- **জানাজা:** তাঁর অসিয়ত বা ইচ্ছা অনুযায়ী মদীনার তৎকালীন গভর্নর ও বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান। অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী, উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদের মদীনার গভর্নর ওয়ালিদ ইবনে উতবা তাঁর জানাজা পড়িয়েছিলেন।

- **দাফন:** জানাজা শেষে মদীনার ঐতিহাসিক কবরস্থান **জান্নাতুল বাকি**-তে উম্মাহাতুল মুমিনিনের জন্য নির্ধারিত স্থানে তাঁকে পরম শ্রদ্ধায় দাফন করা হয়।

একটি যুগের অবসান: হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর ইন্তেকালের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকা স্ত্রীদের যুগের অবসান ঘটে। তিনি শুধু একজন স্ত্রীই ছিলেন না, বরং ইসলামের সংকটময় মুহূর্তে তাঁর প্রজ্ঞা এবং শেষ জীবন পর্যন্ত নবী পরিবারের প্রতি তাঁর ভালোবাসা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক চিরন্তন অনুপ্রেরণা।

হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা.)

হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম স্ত্রী এবং "উম্মুল মুমিনিন" (বিশ্বাসী জননী)। ইসলামের ইতিহাসে তিনি তাঁর দানশীলতা, আত্মমর্যাদাবোধ এবং তাকওয়ার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর জন্ম, বংশ পরিচয় এবং শৈশবকাল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিচে তুলে ধরা হলো:

জন্ম ও আসল নাম

- **জন্ম:** হযরত জয়নব (রা.) আনুমানিক ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে বয়সে প্রায় ২০ বছরের ছোট ছিলেন।
- **নাম পরিবর্তন:** তাঁর জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয়েছিল **"বাররাহ"**। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন আল্লাহর রাসুল (সা.) তাঁর নাম পরিবর্তন করে **"জয়নব"** রাখেন।

উচ্চমর্যাদাপূর্ণ বংশ পরিচয়

হযরত জয়নব (রা.) মক্কার অত্যন্ত কুরাইশ বংশের এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেড়ে ওঠেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারের সাথে তাঁর রক্তের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ।

- **পিতা:** তাঁর পিতা ছিলেন **জাহশ ইবনে রিয়াব**। তিনি মক্কার বনু আসাদ ইবনে খুজায়মাহ গোত্রের একজন অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন।
- **মাতা:** তাঁর মাতা ছিলেন **উমাইমা বিনতে আবদুল মুত্তালিব**। উমাইমা ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আপন ফুফু। সেই সূত্রে হযরত জয়নব (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর **আপন ফুফাতো বোন**।

- **ভাই-বোন:** তাঁর পরিবারটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত বিখ্যাত। ওহুদ যুদ্ধের মহান শহীদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.) ছিলেন তাঁর ভাই এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আরেক পবিত্র স্ত্রী হযরত উম্মে হাবিবা (রা.)-এর প্রথম স্বামী ওবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশও ছিলেন তাঁর ভাই।

শৈশব ও লালন-পালন

- **আদুরে ও রাজকীয় পরিবেশ:** কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় এবং প্রভাবশালী হাশেমি বংশের (মায়ের দিক থেকে) সাথে সম্পর্কিত থাকায় জয়নব (রা.)-এর শৈশব কেটেছে অত্যন্ত মর্যাদা ও বিলাসিতার মধ্যে। মক্কার অভিজাত সমাজের নিয়ম অনুযায়ী তিনি লৌকিকতা, শালীনতা এবং আত্মমর্যাদার সাথে লালিত-পালিত হন।

হস্তশিল্পে পারদর্শিতা: শৈশব ও কৈশোরে তিনি চামড়ার কাজ এবং বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পের কাজে দারুণ দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি নিজ হাতে চামড়া পাকা করতেন, সুতা কাটতেন এবং তা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতেন। পরবর্তীতে তাঁর এই গুণের কারণে তিনি মদীনার জীবনে অনেক অর্থ উপার্জন করতেন এবং তার সম্পূর্ণটাই গরিব-দুঃখীদের মাঝে দান করে দিতেন।

- **স্বভাব ও চরিত্র:** শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষী, আত্মমর্যাদাশীল এবং ইবাদতগুজার স্বভাবের ছিলেন। তাঁর এই দৃঢ় মানসিকতা পরবর্তীতে ইসলামের প্রথম যুগের কঠিন পরিস্থিতি ও হিজরতের সময় বড় ভূমিকা রেখেছিল।

একটি বিশেষ মর্যাদা: জয়নব (রা.) কুরাইশ বংশের এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন যে, তৎকালীন আরবের ধনী ও প্রভাবশালী যুবকেরা তাঁকে বিয়ে করার জন্য উন্মুখ ছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় পরবর্তীতে তাঁর জীবন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ঐতিহাসিক মোড় নেয়।

হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা.) এবং হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.)-এর বিয়ে এবং পরবর্তী সময়ে বিচ্ছেদের ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাস:

১. বিয়ের পটভূমি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মুক্ত করে দেওয়া দাস এবং পালক পুত্র (তৎকালীন আরবে তাঁকে 'যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ' বা মুহাম্মদের ছেলে যায়েদ বলে ডাকা হতো)। অন্যদিকে, হযরত জয়নব (রা.) ছিলেন কুরাইশ বংশের এক

অতি সম্ভ্রান্ত ও উচ্চমর্যাদাশীল পরিবারের সন্তান এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আপন ফুফাতো বোন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) চাইলেন সমাজে বংশীয় অহংকার দূর করতে এবং এটি প্রমাণ করতে যে, একজন মুক্ত হওয়া দাসও মর্যাদার দিক থেকে একজন উচ্চবংশীয় নারীর সমকক্ষ হতে পারে। তাই তিনি স্বয়ং জয়নব (রা.)-এর কাছে যায়েদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান।

২. জয়নব (রা.)-এর প্রাথমিক অসম্মতি ও কোরআনের আয়াত

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মুখ থেকে যায়েদের বিয়ের প্রস্তাব শুনে হযরত জয়নব এবং তাঁর ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ প্রথমে রাজি হননি। কারণ তৎকালীন আরবের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী, কোনো উচ্চবংশীয় স্বাধীন নারী একজন প্রাক্তন দাসের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে মর্যাদাহানিকর মনে করত। জয়নব (রা.) বলেছিলেন, *"হে আল্লাহর রাসুল! আমি বংশের দিক থেকে তাঁর চেয়ে উত্তম।"*

তাঁদের এই দ্বিমতের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাবের ৩৬ নম্বর আয়াত নাজিল করেন:

"আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর সেই বিষয়ে নিজের কোনো সিদ্ধান্তের এখতিয়ার থাকে না..."

এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত জয়নব (রা.) আল্লাহর আদেশের সামনে নিজের মাথা নত করে দেন এবং অত্যন্ত খুশিমনে হযরত যায়েদ (রা.)-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেই এই বিয়ের মোহরানা পরিশোধ করেছিলেন।

৩. দাম্পত্য কলহ ও মানসিক দূরত্ব

বিয়ের পর তাঁদের সংসার জীবন দীর্ঘস্থায়ী বা সুখের হতে পারেনি। বাহ্যিকভাবে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হলেও মানসিকভাবে তাঁদের মধ্যে গভীর দূরত্ব তৈরি হয়।

- হযরত জয়নব (রা.) চাইলেও তাঁর মনের ভেতরের বংশীয় উচ্চমর্যাদার বোধটি পুরোপুরি দূর করতে পারছিলেন না, যা অবচেতনভাবেই হোক বা স্বাভাবিভাবেই হোক, তাঁর আচরণে প্রকাশ পেয়ে যেত।
- হযরত যায়েদ (রা.) ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল সাহাবি। জয়নবের আচরণে তিনি মানসিকভাবে কষ্ট পেতেন এবং তাঁর মনে হতো জয়নব তাঁকে স্বামী হিসেবে মন থেকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারছেন না।

ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যকার এই মানসিক অমিল ও কলহ চূড়ান্ত রূপ নেয়।

৪. হযরত যায়েদের অভিযোগ ও রাসুল (সা.)-এর পরামর্শ

সংসার টিকিয়ে রাখা অসম্ভব বুঝতে পেরে হযরত যায়েদ (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে যান এবং জয়নবকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ তিনি নিজেই এই বিয়ে দিয়েছিলেন এবং তৎকালীন সমাজে এটি ভেঙে গেলে একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারত। এছাড়া আল্লাহ তাআলা রাসুল (সা.)-কে ওহীর মাধ্যমে আগেই কিছুটা আভাস দিয়েছিলেন যে, এই বিয়েটি ভেঙে যাবে এবং পরবর্তীতে জয়নবের সাথে রাসুল (সা.)-এর বিয়ে হবে (যাতে আরবের পালক পুত্রের প্রথা ভাঙা যায়)। কিন্তু লোকলজ্জা ও কাফেরদের অপবাদের ভয়ে রাসুল (সা.) বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন এবং যায়েদকে বারবার বোঝাচ্ছিলেন।

পবিত্র কোরআনে এই পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে:

"স্মরণ করো, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ (যায়েদ), তুমি তাকে বলছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো।' তুমি তোমার অন্তরে গোপন করছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন এবং তুমি মানুষকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত ছিল।" (সূরা আহযাব: ৩৭)

রাসুল (সা.)-এর এত বোঝানোর পরও যখন তাঁদের মধ্যকার অমিল কোনোভাবেই দূর হলো না, তখন নিরুপায় হয়ে হযরত যায়েদ (রা.) হযরত জয়নব (রা.)-কে তালাক দিয়ে দেন এবং তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে।

৫. এই বিচ্ছেদের পেছনের ইসলামের মূল শিক্ষা

এই বিয়ে এবং বিচ্ছেদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দুটি বড় সামাজিক সংস্কার সম্পন্ন করেছিলেন:

১. ইসলামে বংশীয় অহংকারের কোনো স্থান নেই: একজন প্রাক্তন দাসের সাথে কুরাইশ বংশের মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছিল যে, তাকওয়াই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি।

২. পালক পুত্র কখনো আপন পুত্র নয়: তৎকালীন আরবে পালক পুত্রকে নিজের আপন সন্তানের মতোই মনে করা হতো এবং তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম মনে

করা হতো। আল্লাহ তাআলা এই কুসংস্কার ভাঙার জন্যই যায়েদ ও জয়নবের বিচ্ছেদকে তকদীরে রেখেছিলেন, যাতে পরবর্তীতে রাসুল (সা.)-এর সাথে জয়নবের বিয়ের মাধ্যমে এই নিয়মটি চিরতরে বাতিল হয়ে যায়।

রাসুল(সা.) এর সাথে যায়নাব (রা.) বিয়ে

হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা.) এবং হযরত যায়েদ (রা.)-এর বিচ্ছেদের পর, আল্লাহ তাআলা আরবের এক যুগান্তকারী কুসংস্কার ভাঙার জন্য স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হযরত জয়নবের বিবাহের ফয়সালা করেন। ইসলামের ইতিহাসে এই বিবাহটি অত্যন্ত অলৌকিক এবং অনন্য, কারণ এর বিবাহ স্বয়ং আসমানে আল্লাহ তাআলা সম্পন্ন করেছিলেন। নিচে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও আরবের কুসংস্কার

তৎকালীন জাহেলি আরবে একটি শক্ত কুসংস্কার ছিল যে, কেউ কোনো সন্তানকে পালক পুত্র বানালে সে রক্তের সম্পর্কের আসল সন্তানের মতোই সমস্ত অধিকার পেয়ে যেত। সমাজ মনে করত, পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা আপন ছেলের বউকে (পুত্রবধূ) বিয়ে করার মতোই জঘন্য ও হারাম।

আল্লাহ তাআলা চাইলেন এই অন্ধ প্রথাটি চিরতরে সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে। আর মুখে শুধু আইন জারি করার চেয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিজের কাজের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা ছিল সবচেয়ে কার্যকর। তাই আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, রাসুল (সা.) যেন তাঁর পালক পুত্র হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী জয়নবকে বিবাহ করেন।

২. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দ্বিধা ও মানুষের ভীতি

রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে আল্লাহ তাঁকে জয়নবের সাথে বিয়ের নির্দেশ দিচ্ছেন, তখন তিনি মানবীয় স্বভাববশত কিছুটা সংকটে পড়েন। তিনি ভাবছিলেন, মুনাফিক, ইহুদি এবং মক্কার কাফেররা অপবাদ ছড়াবে যে—*"মুহাম্মদ নিজের ছেলের বউকে বিয়ে করেছে!"*

লোকনিন্দার এই ভয়ে রাসুল (সা.) বিষয়টি কিছুটা মনে গোপন রেখেছিলেন। তাঁর এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করতে এবং কাফেরদের সামাজিক রক্তচক্ষুর চেয়ে আল্লাহর আদেশকে অগ্রাধিকার দিতে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের **সূরা আল-আহযাবের ৩৭ নম্বর আয়াতের শেষ অংশ** নাজিল করেন:

"...তুমি মানুষকে (নিন্দার) ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত ছিল। অতঃপর যায়েদ যখন তার (জয়নবের) সাথে বিবাহ সম্পর্কের অবসান ঘটাল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম; যাতে মুমিনদের পালক পুত্ররা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহ সম্পর্কের অবসান ঘটালে তাদের (পালক পুত্রদের) স্ত্রীদের বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আর আল্লাহর আদেশ তো কার্যকরী হয়েই থাকে।" (সূরা আল-আহযাব: ৩৭)

৩. আসমানী বিবাহ এবং অভিনব মোহরানা

এই আয়াত নাজিল হওয়ার মাধ্যমে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে। কোনো আনুষ্ঠানিক কাবিননামা, সাক্ষী বা পার্থিব অভিভাবকের মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বিয়ের ঘোষণা দেন।

- **সুসংবাদ দান:** আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) হাসিমুখে অবতীর্ণ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং হযরত জয়নব (রা.)-এর কাছে সুসংবাদ পাঠাতে বলেন। হযরত যায়িদ (যিনি জয়নবের প্রাক্তন স্বামী ছিলেন) নিজেই এই সুসংবাদ নিয়ে জয়নবের ঘরে যান। জয়নব (রা.) এই অনন্য মর্যাদার কথা শুনে সেজদাবনত হন এবং মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।
- **জয়নব (রা.)-এর গর্ব:** হযরত জয়নব (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্য স্ত্রীদের সামনে অত্যন্ত গর্ব করে বলতেন: *"আপনাদের বিয়ে দিয়েছেন আপনাদের অভিভাবক ও পরিবারবর্গ, আর আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের ওপর থেকে সম্পন্ন করেছেন।"* (সহীহ বুখারী)

"আপনাদের বিয়ে দিয়েছেন আপনাদের অভিভাবক ও পরিবারবর্গ, আর আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের ওপর থেকে সম্পন্ন করেছেন।" (সহীহ বুখারী)

৪. ওলিমা এবং পর্দার আয়াত নাজিল (হিজাব বিধান)

হযরত জয়নব (রা.)-এর বিয়ের ওলিমা বা প্রীতিভোজের আয়োজনটি ছিল অত্যন্ত স্মরণীয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) অন্য স্ত্রীদের তুলনায় তাঁর ওলিমায় সবচেয়ে বড় আয়োজন করেছিলেন (রুটি এবং গোশত দিয়ে মানুষকে আপ্যায়ন করা হয়েছিল)।

এই ওলিমার দিনই ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ **"পর্দার বিধান" (হিজাব)** নাজিল হয়। ওলিমার খাবার শেষ হওয়ার পরও কিছু অতিথি রাসুল (সা.)-এর ঘরে বসে দীর্ঘক্ষণ গল্প করছিলেন, যা রাসুল (সা.)-এর জন্য বিব্রতকর ছিল কিন্তু লজ্জায় তিনি কিছু বলতে পারছিলেন না। তখন আল্লাহ তাআলা সূরা আহযাবের ৫৩ নম্বর আয়াত নাজিল করে মুসলিম উম্মাহকে নবীর ঘরে প্রবেশের আদব এবং পর্দার কঠোর বিধান দেন:

"হে মুমিনগণ! তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাবার খাওয়ার জন্য নবীজির ঘরে প্রবেশ করো না... আর তোমরা যখন তাঁর স্ত্রীদের কাছে কোনো কিছু চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটি তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র..." (সূরা আল-আহযাব: ৫৩)

হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা.)-এর বিয়ের ঘটনাটি কেবল একটি সাধারণ বিবাহ ছিল না, বরং এটি ছিল একটি ঐশী মিশন। এর মাধ্যমে আরবের শত বছরের সামাজিক কুসংস্কার ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলিমদের জন্য পালক পুত্রের বিধান আইনগতভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়।

স্ত্রী হিসেবে কেমন ছিলেন যায়নাব (রা.)

ইসলামের ইতিহাসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের (উম্মাহাতুল মুমিনীন) মধ্যে **হযরত যায়নাব বিনতে জাহশ (রা.)** এবং **হযরত যায়নাব বিনতে খুজায়মা (রা.)**—এই দুই জন 'যায়নাব' নামের মহীয়সী নারী ছিলেন। তবে সাধারণত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দাম্পত্য জীবনের আলোচনায় স্ত্রী হিসেবে হযরত যায়নাব বিনতে জাহশ (রা.)-এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষভাবে ফুটে ওঠে।
স্ত্রী হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন, তা নিচে কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

১. দানশীলতা ও উদারতা

স্ত্রী হিসেবে হযরত যায়নাব (রা.) অত্যন্ত দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি নিজের হাতে চামড়া পাকা করা এবং সেলাইয়ের কাজ করতেন। এই কাজ থেকে অর্জিত সমস্ত অর্থ তিনি নিজে না রেখে দরিদ্র, এতিম ও অভাবী মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, *"তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা (দানশীল), সে-ই সবার আগে (মৃত্যুর পর) আমার সাথে মিলিত হবে।"* রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে হযরত যায়নাব (রা.)-ই প্রথম ইন্তেকাল করেন, যা তাঁর অনন্য দানশীলতারই প্রমাণ।

২. গভীর ইবাদত ও খোদাভীতি

তিনি অত্যন্ত বুজুর্গ, ইবাদতগুজার এবং আল্লাহভীরু নারী ছিলেন। রোজা রাখা, নফল নামাজ পড়া এবং আল্লাহর জিকিরে তিনি দীর্ঘ সময় পার করতেন। তাঁর এই গভীর তাকওয়া ও সততার কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও মূল্যায়ন করতেন।

৩. আত্মমর্যাদা ও সত্যবাদিতা

হযরত যায়নাব (রা.) ছিলেন স্পষ্টভাষী এবং অনন্য আত্মমর্যাদার অধিকারী। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে যখন অপবাদ রটানো হয়েছিল (ইফকের ঘটনা), তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত যায়নাবকে আয়েশা (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সতীন হওয়া সত্ত্বেও যায়নাব (রা.) কোনো হিংসা না রেখে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, *"হে আল্লাহর রাসুল! আমি আমার কান ও চোখকে (মিথ্যা থেকে) রক্ষা করতে চাই। আল্লাহর কসম, আমি আয়েশার মধ্যে ভালো ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।"* তাঁর এই সত্যবাদিতার প্রশংসা হযরত আয়েশা (রা.) নিজেও সারাজীবন করেছেন।

৪. পারিবারিক মর্যাদা ও আল্লাহর ফয়সালা

হযরত যায়নাব (রা.)-এর বিয়েটি সাধারণ কোনো বিয়ের মতো ছিল না, বরং স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশে এবং কোরআনের আয়াতের (সূরা আহযাব) মাধ্যমে এই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। এই কারণে তিনি কিছুটা গর্ববোধ করতেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্য স্ত্রীদের বলতেন, *"আপনাদের বিয়ে দিয়েছেন আপনাদের অভিভাবকেরা, আর আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের ওপর থেকে সম্পন্ন করেছেন।"*

সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্ত্রী হিসেবে হযরত যায়নাব (রা.) ছিলেন মহানবী (সা.)-এর একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত, পরিশ্রমী, দানশীল এবং আধ্যাত্মিক জীবনসঙ্গী, যিনি নিজের কর্মঠ হাত ও উদার মন দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরকে আলোকিত করেছিলেন।

হযরত যায়নাব (রা.) এর ইন্তেকাল

হযরত যায়নাব বিনতে জাহশ (রা.)-এর ইন্তেকালের ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত আবেগঘন এবং শিক্ষাদ্দ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাতের পর উম্মাহাতুল মুমিনীনদের (নবীর স্ত্রীদের) মধ্যে তিনিই প্রথম ইন্তেকাল করেন। নিচে তাঁর ইন্তেকালের বিস্তারিত ঘটনাটি তুলে ধরা হলো:

১. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও সত্যতা

মহানবী (সা.) জীবিত থাকাকালীন একদিন তাঁর স্ত্রীদের বলেছিলেন:

"তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা, সে-ই আমার মৃত্যুর পর সবার আগে আমার সাথে এসে মিলিত হবে।"

এই কথা শুনে নবীজী (সা.)-এর স্ত্রীরা আক্ষরিক অর্থেই নিজেদের হাত মেপে দেখতেন কার হাত কত বড়। হযরত সাওদা (রা.)-এর হাত ছিল সবচেয়ে লম্বা। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর যখন হযরত যায়নাব (রা.) সবার আগে ইন্তেকাল করলেন, তখন সবাই বুঝতে পারলেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) আসলে 'লম্বা হাত' বলতে বাহ্যিক হাত বোঝাননি, বরং 'দানের হাত' বা দানশীলতা বুঝিয়েছিলেন। কারণ যায়নাব (রা.) ছিলেন সমস্ত স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল।

২. ইন্তেকালের সময়কাল

হযরত যায়নাব (রা.) দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফতকালে, হিজরি ২০ সনে (আনুমানিক ৬৪০ বা ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে) গ্রীষ্মকালের এক উত্তপ্ত দিনে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৫৩ বছর।

৩. শেষ মুহূর্তের দানশীলতা ও ঘর শূন্য হওয়া

খলিফা হযরত উমর (রা.) যখন রাষ্ট্রীয় কোষাগার (দিওয়ান) থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীদের জন্য বার্ষিক ১২,০০০ দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন, তখন হযরত যায়নাব (রা.) এই বিশাল অর্থ পেয়ে ঘাবড়ে যান। তিনি এটিকে একটি পরীক্ষা বা ফিতনা মনে করেছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, *"হে আল্লাহ! আগামী বছর যেন এই অর্থ আমার কাছে আর না আসে।"*

তিনি সেই টাকা ঘরে আসার সাথে সাথে একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন এবং তাঁর দাসী বারযাহ বিনতে রাফিকে ডেকে মদিনার সমস্ত এতিম, বিধবা এবং অভাবী আত্মীয়দের মাঝে তা বণ্টন করে দিতে বলেন। সব বিলিয়ে দেওয়ার পর দাসী যখন বললেন, "আম্মাজান, এই কাপড়ের নিচে আপনার জন্যও কিছু রয়ে গেছে।" যায়নাব (রা.) তাকিয়ে দেখলেন মাত্র ৮৫ দিরহাম অবশিষ্ট আছে। তিনি সেটিও আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন।

তাঁর মৃত্যুর পর দেখা যায়, তাঁর ঘরে একটি দিরহাম বা দিনারও অবশিষ্ট ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। মৃত্যুর আগে তিনি অসিয়ত করেছিলেন:

"আমি আমার কাফনের কাপড় তৈরি করে রেখেছি। যদি আমিরুল মুমিনীন উমর (রা.) আমার জন্য কাফনের ব্যবস্থা করেন, তবে আমার তৈরি কাপড়টি যেন দান করে দেওয়া হয়।" (পরবর্তীতে সেটাই করা হয়েছিল)।

৪. জানাজা ও দাফন

মদিনার তীব্র গরমের মধ্যে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছিল। হযরত উমর (রা.) নিজেই তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান। প্রচণ্ড রোদের কারণে খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে তাঁর কবরের ওপর একটি তাঁবু বা ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আরব উপদ্বীপে সে সময় নারীদের মরদেহ সাধারণ খাটিয়ায় বহন করা হতো, যার ফলে লাশের আকৃতি ওপর থেকে বোঝা যেত। হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) একটি নিয়ম জানতেন, যেখানে লাশকে সম্পূর্ণ আবৃত করার জন্য বিশেষ কফিন ব্যবহার করা হতো। হযরত যায়নাব (রা.)-এর মরদেহ বহনের জন্য ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে সেই বিশেষ ঢাকা-কফিন ব্যবহার করা হয়।

তাঁর আপন ভাগ্নে ও মাহরাম আত্মীয়রা (যাদের মধ্যে উসামা বিন জায়েদও ছিলেন) তাঁকে মদিনার বিখ্যাত জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে দাফন করেন।

হযরত যায়নাব (রা.)-এর ইন্তেকালে মদিনার দরিদ্র সমাজ শোকে ভেঙে পড়েছিল, কারণ তারা তাদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়দাতাকে হারিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত আয়েশা (রা.) আক্ষেপ করে বলেছিলেন, *"আজ এক অনন্য, প্রশংসনীয় ও ইবাদতগুজার নারী চলে গেলেন, যিনি এতিম ও বিধবাদের একমাত্র ভরসা ছিলেন।"*

হযরত জুয়াইরিয়্যা বিনতে আল হারিস (রা.)

উম্মুল মুমিনীন **হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস (রা.)** ছিলেন আরবের এক সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ বংশের সন্তান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে বিয়ের পূর্বে তাঁর নাম ছিল 'বাররাহ', যা পরবর্তীতে আল্লাহর রাসুল পরিবর্তন করে 'জুয়াইরিয়া' রাখেন। তাঁর জন্ম ও শৈশবের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) আনুমানিক **৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে** আরবের বিখ্যাত **বনু মুস্তালিক** গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এই গোত্রটি ছিল আরবের শক্তিশালী ও প্রভাবশালী 'খুজাআহ' উপজাতির একটি শাখা।

তাঁর পারিবারিক পটভূমি ছিল অত্যন্ত রাজকীয়:

- **পিতা:** আল-হারিস ইবনে আবি দিরার। তিনি ছিলেন বনু মুস্তালিক গোত্রের প্রধান বা রাজা।
- **মর্যাদা:** গোত্রপ্রধানের কন্যা হওয়ার কারণে জুয়াইরিয়া (রা.) শৈশব থেকেই অত্যন্ত মান-সম্মান, বিলাসিতা ও রাজকীয় পরিবেশের মধ্যে বড় হন।

২. শৈশব ও কৈশোরকাল

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-এর শৈশব কেটেছে লোহিত সাগরের উপকূলের কাছে অবস্থিত 'মুরাইসী' নামক একটি ঝরনা বা কূপের আশেপাশের এলাকায়, যেখানে তাঁর গোত্র বসবাস করত। রাজকন্যার মতো বড় হওয়ায় তাঁর শৈশব ও কৈশোরে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়:

- **শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তা:** গোত্রপ্রধানের সন্তান হিসেবে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, দূরদর্শী এবং বাকপটু হিসেবে গড়ে ওঠেন। আরব্য সংস্কৃতি ও নিজ বংশের ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি দারুণ সচেতন ছিলেন।
- **অনিন্দ্য রূপ ও সৌন্দর্য:** তিনি অত্যন্ত রূপবতী ও আকর্ষণীয়া ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) নিজেই তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে বলেছেন, *"জুয়াইরিয়া ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টি ও রূপসী নারী। যে কেউ তাঁকে দেখলেই মুগ্ধ হয়ে যেত।"*
- **বিয়ে ও প্রথম জীবন:** শৈশব পেরিয়ে যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন তাঁর গোত্রেরই এক বীর যোদ্ধা ও প্রভাবশালী ব্যক্তি মুসাফি ইবনে সাফওয়ানের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। (পরবর্তীতে হিজরি ৫ম বা ৬ষ্ঠ সনে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে

এই স্বামী নিহত হয় এবং জুয়াইরিয়া বন্দি হন, যার পর মহানবী সা.-এর সাথে তাঁর বিয়ের ঐতিহাসিক পথ সুগম হয়)।

৩. তৎকালীন ধর্মীয় পরিবেশ

শৈশবে জুয়াইরিয়া (রা.) ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তাঁর পুরো পরিবার এবং গোত্র মূর্তিপূজক ছিল। তবে শৈশব থেকে পাওয়া তাঁর মার্জিত স্বভাব, আত্মমর্যাদা এবং সত্যকে গ্রহণ করার মানসিকতাই পরবর্তীতে তাঁকে বন্দিদশা থেকে ইসলামের সর্বোচ্চ সম্মানিত আসনে (উম্মুল মুমিনীন) আসীন হতে সাহায্য করেছিল।

সংক্ষেপে, হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-এর শৈশব ছিল আরবের এক ঐতিহ্যবাহী রাজপরিবারের আদরে ও ঐশ্বর্যে ঘেরা, যা তাঁকে একজন আত্মমর্যাদাশীল ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের নারী হিসেবে গড়ে তুলেছিল।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত অলৌকিক, মর্যাদাপূর্ণ এবং একটি পুরো গোত্রের ভাগ্য পরিবর্তনের ঐতিহাসিক দলিল। তাঁর ইসলাম গ্রহণ কেবল একজন ব্যক্তির ধর্ম পরিবর্তন ছিল না, বরং এর পেছনে জড়িয়ে ছিল মহানবী (সা.)-এর মহানুভবতা।

পুরো ঘটনাটি নিচে কয়েকটি ধাপে তুলে ধরা হলো:

১. বনু মুস্তালিক যুদ্ধ ও বন্দিদশা (হিজরি ৫ম বা ৬ষ্ঠ সন)

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-এর পিতা এবং বনু মুস্তালিক গোত্রের প্রধান আল-হারিস মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। খবর পেয়ে মহানবী (সা.) সাহাবিদের নিয়ে মদিনার অদূরে 'মুরাইসী' নামক স্থানে আকস্মিক অভিযান চালান। যুদ্ধে বনু মুস্তালিক গোত্র চরমভাবে পরাজিত হয়। জুয়াইরিয়ার স্বামী মুসাফি ইবনে সাফওয়ান এই যুদ্ধে নিহত হন এবং গোত্রপ্রধানের কন্যা জুয়াইরিয়াসহ প্রায় ৭০০ জন পুরুষ, নারী ও শিশু মুসলমানদের হাতে বন্দি হন।

২. দাসত্বের মুক্তিপণ (কিতাবাত) চুক্তি

আরবের নিয়ম অনুযায়ী বন্দিদের মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। জুয়াইরিয়া (রা.) অংশ হিসেবে পড়েন বিখ্যাত আনসার সাহাবি হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রা.)-এর ভাগে।

একজন রাজকন্যা হয়ে দাসত্বের জীবন মেনে নেওয়া তাঁর আত্মমর্যাদায় আঘাত করেছিল। তাই তিনি সাবিত ইবনে কায়েসের সাথে একটি **'কিতাবাত'** চুক্তি করেন

(যার অর্থ: নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা মুক্তিপণের বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ)। কিন্তু তৎকালীন সময়ে একজন বন্দি নারীর পক্ষে সেই বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণের টাকা জোগাড় করা অসম্ভব ছিল।

৩. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে জুয়াইরিয়া

মুক্তির আশায় এবং সাহায্যের জন্য জুয়াইরিয়া সরাসরি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তাঁবুতে হাজির হন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন:

"জুয়াইরিয়া যখন দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন, আমি তাঁকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম যে আল্লাহর রাসুলও তাঁর রূপ ও বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হবেন (যা পরবর্তীতে তাঁর প্রতি দয়ার কারণ হয়েছিল)।"

জুয়াইরিয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে গিয়ে অত্যন্ত মার্জিত ও দৃঢ় কণ্ঠে বললেন:
"হে আল্লাহর রাসুল! আমি আল-হারিসের কন্যা জুয়াইরিয়া। আমার পিতা তাঁর গোত্রের প্রধান (রাজা)। আমি যে বিপদে পড়েছি তা আপনার অজানা নয়। আমি সাবিত ইবনে কায়েসের সাথে মুক্তিপণের চুক্তি করেছি, কিন্তু তা পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। তাই আমি আপনার কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে এসেছি।"

৪. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রস্তাব ও ইসলাম গ্রহণ

মহানবী (সা.) জুয়াইরিয়ার বংশমর্যাদা, বুদ্ধিমত্তা এবং করুণ অবস্থা দেখে অত্যন্ত দয়াশীল হলেন। তিনি তাঁকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে চিরতরে মুক্তি দেওয়ার পাশাপাশি আরবের শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন:
"তোমার জন্য কি এর চেয়েও উত্তম কোনো ফয়সালা আছে, যা আমি করতে পারি?"
জুয়াইরিয়া জিজ্ঞেস করলেন, *"সেটি কী, হে আল্লাহর রাসুল?"*
রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, *"আমি তোমার পক্ষ থেকে পুরো মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ করে দেব এবং তোমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ (বিয়ে) করব।"*

এই মহানুভবতা এবং অভাবনীয় প্রস্তাব শুনে জুয়াইরিয়া (রা.) অত্যন্ত আনন্দিত ও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাত ধরে **ইসলাম গ্রহণ করেন** এবং বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি জানান।

রাসুলুল্লাহ (সা.) চুক্তি অনুযায়ী সাবিত ইবনে কায়েস (রা.)-কে জুয়াইরিয়ার মুক্তির পুরো অর্থ পরিশোধ করে দেন এবং তাঁকে দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ঘোষণা করেন। এরপর ৪ শত দিরহাম মোহরানা নির্ধারণ করে রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-কে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করেন। বিয়ের সময় হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-এর বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর।

৫. একটি ইসলাম গ্রহণের ফলে পুরো গোত্রের মুক্তি

যখন মদিনার সাহাবিরা জানতে পারলেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) জুয়াইরিয়া (রা.)-কে বিয়ে করেছেন এবং বনু মুস্তালিক গোত্র এখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শ্বশুরবাড়ির লোক (বৈবাহিক আত্মীয়), তখন সাহাবিরা বললেন: *"আল্লাহর রাসুলের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাদের কাছে বন্দি থাকতে পারে না।"*

সাহাবিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বনু মুস্তালিক গোত্রের প্রায় **১০০টি পরিবারের** সমস্ত বন্দিকে কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই একযোগে মুক্ত করে দেন।

গোত্রপ্রধান পিতার ইসলাম গ্রহণ

জুয়াইরিয়ার পিতা এবং বনু মুস্তালিকের রাজা আল-হারিস যখন তাঁর কন্যাকে মুক্ত করার জন্য উটের বহর নিয়ে মদিনার দিকে আসছিলেন, তখন পথেই তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কিছু অলৌকিক নিদর্শন ও মোজেজা দেখতে পান। মদিনায় পৌঁছে যখন তিনি দেখলেন তাঁর কন্যা কোনো বন্দি বা দাসী নন, বরং তিনি এখন মুসলমানদের সম্মানিত 'আম্মাজান' (উম্মুল মুমিনীন), এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মহানুভবতায় তাঁর পুরো গোত্র মুক্ত হয়ে গেছে—তখন তিনি অভিভূত হয়ে যান। আল-হারিস এবং তাঁর সাথে আসা গোত্রের অন্যান্য নেতারা তৎক্ষণাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-এর এই বিয়েটি ছিল মূলত আরবের একটি যুদ্ধবাজ ও শত্রু গোত্রকে চিরদিনের জন্য ইসলামের পরম মিত্রে পরিণত করার এক মহান ঐশ্বরিক ফয়সালা। এই বিয়ের মাধ্যমে বনু মুস্তালিক গোত্র ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে।

হযরত আয়েশা (রা.) জুয়াইরিয়া (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ও বিয়ের বরকত সম্পর্কে আক্ষেপ করে বলেছিলেন:

"আমি দুনিয়াতে জুয়াইরিয়ার চেয়ে তাঁর নিজের গোত্রের জন্য এত বেশি বরকতময় ও কল্যাণময় আর কোনো নারীকে দেখিনি। তাঁর একটিমাত্র সিদ্ধান্তের কারণে তাঁর পুরো গোত্র দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিল।"

রাসুল (সা.) এর প্রতি ভালোবাসা

উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস (রা.)-এর অন্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি যে গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল, তা কেবল একজন স্ত্রীর স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ছিল না, বরং তা ছিল একজন মুমিনের তাঁর চিরন্তন গাইড ও ত্রাতার প্রতি পরম ভক্তি।

যে রাসুল (সা.) তাঁর জীবনকে দাসত্বের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি হযরত জুয়াইরিয়ার ভালোবাসার ধরণটি ছিল অনন্য। নিচে কয়েকটি দিক থেকে তাঁর এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ তুলে ধরা হলো:

১. আনুগত্য ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) তাঁর রাজকীয় অতীতের সমস্ত অহংকার ও আভিজাত্য ভুলে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি কথা ও নির্দেশকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ পাথেয় মনে করতেন। আল্লাহর রাসুল তাঁর নাম 'বাররাহ' পরিবর্তন করে যখন 'জুয়াইরিয়া' রাখলেন, তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করেন এবং রাসুলের দেওয়া এই পরিচয়কেই নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব মনে করতেন।

২. ইবাদতের মাধ্যমে রাসুলের সান্নিধ্য লাভ

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) অত্যন্ত ইবাদতগুজার ছিলেন। তিনি জানতেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর ইবাদত ও জিকির পছন্দ করেন। তাই স্বামীকে খুশি করতে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে রাসুলের আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য পেতে তিনি দীর্ঘ সময় জায়নামাজে কাটাতেন।

একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) সকালের নামাজের পর জুয়াইরিয়া (রা.)-কে জিকির করা অবস্থায় রেখে ঘরের বাইরে যান। দুপুরে ফিরে এসেও তাঁকে একই অবস্থায় বসে থাকতে দেখে রাসুল (সা.) অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, *"তুমি কি সকাল থেকে এই এক ফোটা জায়গাতেই বসে আছ?"* জুয়াইরিয়া (রা.) গভীর ভালোবাসার সাথে জবাব দিলেন, *"হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল।"* তখন রাসুল (সা.) তাঁকে সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত

ফজিলতপূর্ণ একটি জিকির শিখিয়ে দেন (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আদাদা খালকিহি...)। রাসুলের এই শিক্ষা তিনি সারাজীবন পরম যত্নে আমল করেছেন।

৩. রাসুলের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কারণে জুয়াইরিয়া (রা.) তাঁর অন্য স্ত্রীদের (সতীনদের) সাথে অত্যন্ত মধুর ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তিনি কখনো রাসুল (সা.)-এর মনে কষ্ট বা পারিবারিক অশান্তি তৈরি হতে দেননি। হযরত আয়েশা (রা.)-সহ নবী পরিবারের সবাই তাঁর এই শান্ত ও মার্জিত স্বভাবের কারণে তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। রাসুল (সা.)-এর সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

৪. রাসুলের হাদিস সংরক্ষণ ও প্রচার

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার একটি বড় প্রমাণ হলো তাঁর বাণী বা হাদিসকে হৃদয়ে ধারণ করা। হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) রাসুল (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি ৭টি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা পরবর্তী উম্মতের জন্য এক বিশাল নিয়ামত। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ তাঁর বর্ণিত হাদিসগুলো সংকলন করেছেন। রাসুলের প্রতিটি আচরণ ও কথাকে তিনি কতটা মনোযোগ ও ভালোবাসা দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন, এই হাদিসগুলো তারই প্রমাণ।

৫. ওফাতের পর রাসুলের স্মৃতি আঁকড়ে থাকা

হিজরি ১১ সনে যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) ইন্তেকাল করেন, তখন হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-এর বয়স ছিল মাত্র ২৭ বছর। তরুণ বয়সে স্বামীকে হারিয়ে তিনি মানসিকভাবে গভীরভাবে শোকাহত হন। কিন্তু রাসুলের প্রতি ভালোবাসার টানে তিনি বাকি জীবন (দীর্ঘ প্রায় ৩৯ বছর) আর কারো সাথে সংসার করার কথা ভাবেননি (যদিও উম্মুল মুমিনীন হিসেবে অন্য কারো সাথে বিয়ে হওয়া কোরআন অনুযায়ী নিষিদ্ধ ছিল)। তিনি রাসুলের স্মৃতি বিজড়িত মদিনা নগরীতেই থেকে যান এবং ইবাদত, রোজা ও রাসুলের রেখে যাওয়া দ্বীনের শিক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

সংক্ষেপে, হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-এর কাছে রাসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন একাধারে তাঁর দয়ালু স্বামী, তাঁর গোত্রের উদ্ধারকর্তা এবং তাঁর ইহকাল ও পরকালের মুক্তির দূত। তাঁর সেই ভালোবাসা প্রকাশিত হতো তাঁর নীরব সাধনা, গভীর খোদাভীতি এবং রাসুলের সুন্নতের প্রতি নিখাদ আনুগত্যের মধ্য দিয়ে।

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) এর ইন্তেকাল

উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস (রা.)-এর ইন্তেকাল বা মৃত্যুর ঘটনাটি তাঁর শান্ত, সংযমী এবং ইবাদতগুজার জীবনের একটি সুন্দর সমাপ্তি ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি দীর্ঘ সময় জীবিত ছিলেন এবং মদিনায় অবস্থান করেই দ্বীনের আলো ছড়িয়েছেন।

তাঁর ইন্তেকালের বিস্তারিত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. ইন্তেকালের সময়কাল

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) বিখ্যাত উমাইয়া খলিফা হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকালে **হিজরি ৫০ সনে** (কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী হিজরি ৫৬ সনে, অর্থাৎ আনুমানিক ৬৭০ বা ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) মদিনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন।

২. বয়স

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় **৬৫ বছর**। মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি প্রায় ৩৯ থেকে ৪৫ বছর বেঁচে ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময় তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্মৃতি বুকে নিয়ে একাকী কাটিয়ে দেন।

৩. জানাজা ও দাফন

তাঁর ইন্তেকালের পর মদিনার তৎকালীন গভর্নর এবং প্রখ্যাত সাহাবি **হযরত মারওয়ান ইবনুল হাকাম** তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান। মদিনার সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করে সাহাবি ও তাবেয়িগণ অত্যন্ত শোকাকুল হৃদয়ে তাঁর জানাজায় অংশ নেন।

জানাজা শেষে উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-কে মদিনার পবিত্র **'জান্নাতুল বাকি'** কবরস্থানে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যান্য পবিত্র স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের পাশেই দাফন করা হয়।

৪. রেখে যাওয়া চিরন্তন শিক্ষা

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-এর মৃত্যুর মাধ্যমে আরবের এক মহান রাজকন্যার জীবনাবসান ঘটে, যিনি নিজের রাজকীয় পরিচয় ছেড়ে আল্লাহর রাসুলের ঘরে একজন সাধারণ দাসী থেকে বিশ্বাসের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালে মদিনার মানুষ একজন অত্যন্ত দয়ালু, আত্মমর্যাদাশীল এবং নিঃস্বার্থ অভিভাবককে হারিয়েছিল। উম্মতের জন্য তিনি রেখে গেছেন তাঁর পবিত্র জীবনের আদর্শ এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মূল্যবান কিছু হাদিস।

হযরত উম্মে হাবিবা (রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান) (রা.)

উম্মুল মুমিনীন **হযরত উম্মে হাবিবা (রা.)** ছিলেন আরবের কুরাইশ বংশের অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মর্যাদাপূর্ণ এক রাজপরিবারের সন্তান। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বিয়ের পূর্বে তাঁর আসল নাম ছিল **'রামলাহ'**। তবে তাঁর বড় মেয়ে হাবিবার নামানুসারে তাঁকে 'উম্মে হাবিবা' (হাবিবার মা) বলে ডাকা হতো এবং ইতিহাসে তিনি এই নামেই সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

তাঁর জন্ম ও শৈশবের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) আরবের মক্কা নগরীর বিখ্যাত কুরাইশ বংশের 'বনু উমাইয়া' শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সঠিক বছর নিয়ে কিছুটা মতভেদ থাকলেও, ধারণা করা হয় তিনি মহানবী (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির প্রায় ১৭ বছর পূর্বে (আনুমানিক **৫৯৩-৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে**) জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পারিবারিক পরিচিতি ছিল আরবের রাজনীতি ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু:

- **পিতা:** আবু সুফিয়ান ইবনে হারব। তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশদের প্রধান নেতা, সেনাপতি এবং আরবের অন্যতম প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি। (ইসলামের প্রথম যুগে তিনি দীর্ঘ সময় মুসলমানদের প্রধান শত্রু ছিলেন, তবে মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন)।
- **মা:** সাফিয়্যাহ বিনতে আবিল আস। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফু আতিকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের দিক থেকে আত্মীয় এবং খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর আপন ফুফু।
- **ভাই:** হযরত মুয়াবিয়া (রা.), যিনি পরবর্তীতে ইসলামের বিখ্যাত খলিফা এবং উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হন।

২. শৈশব ও কৈশোরকাল

কুরাইশ বংশের প্রধান নেতার কন্যা হওয়ায় উম্মে হাবিবা (রা.)-এর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে চরম বিলাসিতা, প্রাচুর্য এবং রাজকীয় মর্যাদার মধ্য দিয়ে। তৎকালীন আরবের সাধারণ মেয়েদের চেয়ে তাঁর জীবন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন:

- **আভিজাত্য ও শিক্ষা:** কুরাইশ রাজপরিবারের সন্তান হিসেবে শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত মার্জিত, আত্মমর্যাদাশীল এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হিসেবে গড়ে

ওঠেন। আরবের রাজনীতি, বংশমর্যাদা এবং সামাজিক নিয়মকানুন তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন।

- **স্বাক্ষরতা ও জ্ঞান:** তৎকালীন আরবে নারীদের মধ্যে লেখাপড়ার চল খুব একটা ছিল না। কিন্তু উম্মে হাবিবা (রা.) শৈশবেই লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন, যা তাঁর উচ্চ শিক্ষিত ও দূরদর্শী ব্যক্তিত্বের প্রমাণ দেয়।
- **দৃঢ় ও স্বাধীন ব্যক্তিত্ব:** রাজকীয় পরিবেশে বড় হলেও তাঁর চিন্তা-চেতনা ছিল অত্যন্ত স্বাধীন ও সত্যসন্ধানী। পিতার অগাধ ক্ষমতা বা অন্ধ পৌত্তলিকতা তাঁর মনকে কখনো আচ্ছন্ন করতে পারেনি। শৈশব থেকে পাওয়া এই স্বাধীন চেতনার কারণেই পরবর্তীতে যখন মক্কার পুরো রাজপরিবার ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল, তখন তিনি একাই সত্যকে চিনে ইসলাম গ্রহণ করার সাহস দেখিয়েছিলেন।

প্রথম বিবাহ

হযরত উম্মে হাবিবা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে এবং ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে এক চরম ত্যাগ, আত্মবিশ্বাস এবং ঈমানের কঠিন পরীক্ষার অনন্য দলিল। মক্কার সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতার কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তিনি সত্যের খোঁজে যে সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন, তা অভূতপূর্ব।

নিচে তাঁর প্রথম বিয়ে এবং ইসলাম গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

১. প্রথম বিবাহ

কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করার পর মক্কার প্রথা অনুযায়ী উম্মে হাবিবা (রা.)-এর বিয়ে হয় **উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশ**-এর সাথে। উবায়দুল্লাহ ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ফুফাতো ভাই (নবীজীর ফুফু উমাইমা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে) এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব বিনতে জাহশ (রা.)-এর আপন ভাই। উবায়দুল্লাহ তৎকালীন মক্কার একজন চিন্তাশীল ও সত্যসন্ধানী মানুষ ছিলেন।

২. ইসলাম গ্রহণ (মক্কী জীবন)

নবুয়তের সূচনালগ্নেই মহানবী (সা.) যখন মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন উম্মে হাবিবা (রা.) এবং তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশ মক্কার অন্ধ পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজা বর্জন করে একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

তাঁরা দুজনেই একদম প্রথম দিকেই **ইসলাম গ্রহণ করেন**। তখন ইসলামের ইতিহাসে 'সাবেকুনাল আওয়ালুন' বা প্রথম যুগের মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হন তাঁরা।

৩. পারিবারিক বিরোধিতা ও ঈমানের পরীক্ষা

উম্মে হাবিবা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের এই সিদ্ধান্ত ছিল তৎকালীন মক্কার জন্য একটি বিশাল ঘটনা। কারণ তাঁর পিতা **আবু সুফিয়ান** ছিলেন কুরাইশদের প্রধান নেতা এবং ইসলামের সবচেয়ে বড় ও ঘোর বিরোধী। নিজের ঘরের কন্যা ও জামাতা ইসলাম গ্রহণ করায় আবু সুফিয়ানের মর্যাদায় চরম আঘাত লাগে।

আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশ বংশের অন্যান্য নেতারা উম্মে হাবিবা ও তাঁর স্বামীর ওপর তীব্র মানসিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি করেন, যাতে তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করে পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে যান। কিন্তু উম্মে হাবিবা (রা.) পিতার অগাধ ক্ষমতা, ধন-সম্পদ এবং মক্কার রাজকীয় বিলাসিতার মায়া ত্যাগ করে নিজের ঈমান ও ইসলামের ওপর পাহাড়ের মতো অটল থাকেন।

৪. আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) হিজরত

মক্কায় যখন মুসলমানদের ওপর কাফেরদের অত্যাচার ও নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছায়, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) হিজরত করার নির্দেশ দেন।

ঈমান রক্ষা করার তাগিদে এবং পিতার জুলুম থেকে বাঁচতে হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) তাঁর স্বামীর সাথে দ্বিতীয় দফায় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এই দূর প্রবাসে থাকা অবস্থাতেই তাঁদের ঘরে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়, যার নাম রাখা হয় **'হাবিবা'**। আর এই মেয়ের নামানুসারেই রামলাহর নাম হয়ে যায় 'উম্মে হাবিবা' (হাবিবার মা)।

একটি করুণ মোড় (স্বামীর ধর্মত্যাগ):

আবিসিনিয়ায় পৌঁছানোর পর উম্মে হাবিবা (রা.)-এর জীবনে এক চরম বিপর্যয় নেমে আসে। তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশ সেখানে গিয়ে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন (মুরতাদ হয়ে যান)। উবায়দুল্লাহ তাঁর স্ত্রী উম্মে হাবিবাকেও খ্রিস্টান হওয়ার জন্য জোর চাপ দেন।

কিন্তু উম্মে হাবিবা (রা.) ছিলেন ঈমানে অবিচল। তিনি স্বামীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, তিনি কোনো অবস্থাতেই সত্য দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করবেন না। ফলে উবায়দুল্লাহর সাথে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর কিছুকাল পরেই উবায়দুল্লাহ অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে আবিসিনিয়াতেই মারা যান।

পিতা ইসলামের শত্রু, স্বামী ধর্মত্যাগী হয়ে মৃত—এমতাবস্থায় একাকী কোলবালক সন্তান নিয়ে সুদূর প্রবাসে উম্মে হাবিবা (রা.) যে চরম অসহায়ত্ব ও কষ্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা কেবল তাঁর সুদৃঢ় ঈমানের কারণেই সহ্য করা সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁর এই অসামান্য ত্যাগের প্রতিদান স্বরূপ স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) দূর প্রবাসেই তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান।

রাসুলের সাথে বিয়ে

হযরত উম্মে হাবিবা (রা.)-এর সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিবাহের ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম চমৎকার, আবেগঘন এবং অলৌকিক ঘটনা। দূর প্রবাসে যখন তিনি চরম একা, অসহায় এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন, তখন স্বয়ং আল্লাহর রাসুল (সা.) তাঁর প্রতি ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেন।

এই ঐতিহাসিক বিয়ের বিবরণ নিচে কয়েকটি ধাপে তুলে ধরা হলো:

১. স্বপ্নের মাধ্যমে সুসংবাদ

স্বামী উবায়দুল্লাহর ধর্মত্যাগ ও মৃত্যুর পর উম্মে হাবিবা (রা.) যখন শিশু কন্যা হাবিবাকে নিয়ে আবিসিনিয়ায় গভীর উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন তিনি একটি অলৌকিক স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে কে যেন তাঁকে **'উম্মুল মুমিনীন'** (বিশ্বাসীদের মা) বলে ডাকছিল। তিনি চমকে জেগে ওঠেন এবং মনে মনে ভাবলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর জন্য ভালো কোনো ফয়সালা করবেন।

২. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ

মদিনায় বসে মহানবী (সা.) যখন উম্মে হাবিবা (রা.)-এর এই চরম ত্যাগ এবং অসহায়ত্বের খবর জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁর মনস্তাত্ত্বিক ক্ষত দূর করার এবং ইসলামের জন্য তাঁর এই অটলতার সর্বোচ্চ প্রতিদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিশেষ দূত **আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরি (রা.)**-কে আবিসিনিয়ার ন্যায়পরায়ণ খ্রিস্টান রাজা **নাজ্জাশি (Negus)**-এর দরবারে পাঠান। রাসুল (সা.) রাজা নাজ্জাশির মাধ্যমে উম্মে হাবিবাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।

৩. খুশির খবর ও উম্মে হাবিবা (রা.)-এর আনন্দ

একদিন রাজা নাজ্জাশির দাসী 'আবরাহা' উম্মে হাবিবা (রা.)-এর ঘরের দরজায় নক করে। সে এসে আনন্দ সংবাদ দেয় যে, মদিনা থেকে আল্লাহর রাসুল (সা.) তাঁকে

বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন এবং রাজা নাজ্জাশিকে এই বিয়ে সম্পন্ন করার দায়িত্ব দিয়েছেন।

এই অভাবনীয় খুশির খবর শুনে উম্মে হাবিবা এত বেশি আনন্দিত হন যে, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিজের হাতের গহনা, চুড়ি ও আংটি খুলে সেই দাসীকে উপহার দিয়ে দেন।

৪. প্রবাসে এক রাজকীয় বিয়ে (হিজরি ৬ বা ৭ সন)

ইতিহাসের এই অনন্য বিয়েটি সম্পন্ন হয়েছিল **আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া)**, যেখানে স্বয়ং বর (রাসুলুল্লাহ সা.) উপস্থিত ছিলেন না।

- **অভিভাবক (ওয়ালি):** উম্মে হাবিবা (রা.) তাঁর পক্ষ থেকে দূর সম্পর্কের ভাই ও প্রখ্যাত সাহাবি **খালিদ ইবনে সাঈদ (রা.)**-কে বিয়ের অভিভাবক বা ওয়ালি নিযুক্ত করেন।
- **বিয়ের মজলিস:** রাজা নাজ্জাশি তাঁর রাজপ্রাসাদে সমস্ত প্রবাসী মুসলিম সাহাবিদের (যাদের মধ্যে হযরত জাফর ইবনে আবি তালিবও ছিলেন) আমন্ত্রণ জানান এবং রাজকীয় মর্যাদায় বিয়ের মজলিস বসান।
- **মোহরানা:** আরবের প্রথা অনুযায়ী সাধারণত রাসুল (সা.) তাঁর স্ত্রীদের ৪০০ দিরহাম মোহরানা দিতেন। কিন্তু রাজা নাজ্জাশি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সম্মান দেখিয়ে নিজের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে উম্মে হাবিবার জন্য **৪০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা)** মোহরানা নির্ধারণ করে দেন। রাসুল (সা.)-এর অন্য কোনো স্ত্রীর মোহরানা এর চেয়ে বেশি ছিল না।
- **বিয়ে সম্পন্ন ও ওলিমা:** খালিদ ইবনে সাঈদ (রা.) বিয়ে পড়ান এবং রাজা নাজ্জাশি নিজে সবাইকে রাজকীয় খাবার খাইয়ে অলিমার আয়োজন সম্পন্ন করেন।

৫. মদিনায় আগমন

বিয়ের পর রাজা নাজ্জাশি উম্মে হাবিবা (রা.)-কে মদিনায় পাঠানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তিনি দুটি জাহাজে করে উম্মে হাবিবাসহ বাকি সমস্ত প্রবাসী মুসলমানদের অত্যন্ত সসম্মানে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। মদিনায় পৌঁছানোর পর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর এই নতুন জীবনসঙ্গীকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করেন। বিয়ের সময় উম্মে হাবিবার বয়স ছিল আনুমানিক ৩৫ বছর।

৬. এই বিয়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব

এই বিয়ের ফলে মক্কার কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ এক নতুন মোড় নেয়। উম্মে হাবিবার পিতা এবং মক্কার প্রধান নেতা **আবু সুফিয়ান** যখন এই বিয়ের খবর শুনলেন, তখন তিনি নিজের চিরশত্রু রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশংসা না করে পারলেন না। তিনি বলেছিলেন:

"উম্মে হাবিবা এমন এক বীরকে স্বামী হিসেবে পেয়েছে, যার নাক কখনো নিচু করা যায় না (অর্থাৎ, মুহাম্মদ একজন অত্যন্ত সম্মানিত ও যোগ্য পাত্র)।"

এই বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে আবু সুফিয়ানের ইসলামের প্রতি কঠোর মনোভাব অনেকটাই নরম হয়ে আসে, যা পরবর্তীতে হিজরি ৮ম সনে রক্তপাতহীন 'মক্কা বিজয়'-এর পথকে অনেকাংশে সহজ করে দিয়েছিল।

হযরত উম্মে হাবিবা (রা.)-এর সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই বিয়েটি ছিল ঈমান ও ধৈর্যের এক পরম বিজয়। যে কুরাইশ রাজপরিবার তাঁকে ইসলাম গ্রহণের জন্য ত্যাগ করেছিল, আল্লাহ তাআলা তাঁকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চাদরের নিচে আশ্রয় দিয়ে পুরো মুসলিম উম্মাহর চির সম্মানিত মাতা (উম্মুল মুমিনীন) বানিয়ে দিলেন।

স্ত্রী হিসেবে কেমন ছিলেন উম্মে হাবিবা (রা.)

ইসলামের ইতিহাসে উম্মে হাবিবা (রা.)ছিলেন একাধারে অত্যন্ত ধৈর্যশীল, আদর্শবান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অত্যন্ত অনুগত একজন স্ত্রী। নবীজী (সা.)-এর সাথে তাঁর বৈবাহিক জীবন এবং স্ত্রী হিসেবে তাঁর ভূমিকা মুসলিম নারীদের জন্য একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

স্ত্রী হিসেবে তাঁর জীবনের প্রধান দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. গভীর ভালোবাসা ও অনন্য অনুগত্য

উম্মে হাবিবা (রা.) আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। একটি বিখ্যাত ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়:

তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান (তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) যখন মদিনায় এসে রাসূল (সা.)-এর ঘরে তাঁর বিছানায় বসতে গিয়েছিলেন, তখন উম্মে হাবিবা (রা.) দ্রুত বিছানাটি গুটিয়ে নেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাঁর পিতাকে বলেছিলেন যে, এটি আল্লাহর

রাসূলের পবিত্র বিছানা, আর একজন অবিশ্বাসী বা মুশরিক এখানে বসতে পারে না। স্ত্রী হিসেবে স্বামীর সম্মানের প্রতি এমন একনিষ্ঠতা সত্যিই বিরল।

২. ধৈর্য এবং মানসিক দৃঢ়তা

নবীজী (সা.)-এর সাথে বিয়ের আগে উম্মে হাবিবা (রা.)-কে জীবনে চরম কঠিন সময় পার করতে হয়েছে। মক্কায় কাফেরদের নির্যাতন, আবিসিনিয়ায় হিজরত এবং সেখানে তাঁর প্রথম স্বামীর ধর্মত্যাগ ও মৃত্যু—সব মিলিয়ে তিনি এক চরম মানসিক ও সামাজিক সংকটে পড়েছিলেন। রাসূল (সা.) যখন দূর মদিনা থেকে আবিসিনিয়ার রাজার মাধ্যমে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান, তখন তিনি তা অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করেন। বিয়ের পর তিনি নবীজী (সা.)-এর সংসারে একজন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও শান্ত স্বভাবের সঙ্গী হিসেবে জীবন কাটান।

৩. সতীনদের সাথে সুসম্পর্ক

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বহুবিবাহের সংসারে অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনিনের (নবী পত্নীগণ) সাথে উম্মে হাবিবা (রা.)-এর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ। নারীদের স্বাভাবিক ঈর্ষা বা প্রতিযোগিতা থাকলেও, তিনি সর্বদা ঘরের শান্তি বজায় রাখতেন এবং অন্যদের সম্মান করতেন। এমনকি জীবনের শেষ সময়ে তিনি হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং সংসারের সাধারণ মনমালিন্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন।

৪. ইবাদত ও দ্বীনি বিষয়ে সহযোগিতা

স্ত্রী হিসেবে তিনি শুধু সাংসারিক দায়িত্বই পালন করেননি, বরং নবীজী (সা.)-এর সুন্নাহ ও দ্বীনি শিক্ষার একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। নবীজী (সা.)-এর কাছ থেকে তিনি যা শুনতেন, তা নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। যেমন, নবীজী (সা.)-এর কাছে প্রতিদিন ১২ রাকাত সুন্নত সালাতের ফজিলত শোনার পর, তিনি আমৃত্যু তা কখনো ত্যাগ করেননি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, উম্মে হাবিবা (রা.) স্ত্রী হিসেবে ছিলেন **বিশ্বস্ত, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিতপ্রাণ**। রাসূল (সা.)-এর প্রতি তাঁর এই অগাধ ভালোবাসা ও সম্মানের কারণেই তিনি ইসলামের ইতিহাসে 'উম্মুল মুমিনিন' বা বিশ্বাসীদের মাতা হিসেবে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আছেন।

উম্মে হাবিবা (রা.) এর ইন্তেকাল

হযরত উম্মে হাবিবা (রা.)-এর ইন্তেকালের ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত আবেগঘন এবং তাঁর মহান চরিত্রের পরিচায়ক। জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি যে আধ্যাত্মিক সচেতনতা এবং সহমর্মিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

তাঁর ইন্তেকালের সময়কার প্রধান বিবরণগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. ইন্তেকালের সময় ও স্থান

হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) **৪৪ হিজরি অথবা ৪৫ হিজরি** (আনুমানিক ৬৬৪ বা ৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে) মদিনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৩ বা ৭৪ বছর। তখন মদিনায় শাসন চলছিল তাঁর সৎ-ভাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফত আমলের।

২. সতীনদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা (সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত)

মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে তিনি এক অনন্য ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বহুবিবাহের সংসারে সতীনদের মধ্যে টুকটাক যে স্বাভাবিক মনমালিন্য বা ঈর্ষা হয়ে থাকে, সে ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। আল্লাহর দরবারে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ হয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তাঁর সতীনদের ডেকে পাঠান।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন:

"মৃত্যুর শয্যায় উম্মে হাবিবা (রা.) আমাকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'আমাদের মাঝে (সতীনদের মধ্যে) সাধারণত যা কিছু ঘটে থাকে, আল্লাহ যেন আমার ও তোমার সেই সব অতীত ভুলত্রুটি ক্ষমা করেন।' আমি বললাম, 'আল্লাহ আপনাকে এর সবকিছু ক্ষমা করে দিন এবং তা থেকে আপনাকে মুক্ত রাখুন।' আমার কথা শুনে তিনি খুশি হলেন এবং বললেন, 'তুমি আমাকে আনন্দিত করেছ, আল্লাহ তোমাকে আনন্দিত রাখুন।'"

অনুরূপভাবে তিনি হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছেও লোক পাঠিয়ে একইভাবে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। একজন মুমিনের শেষ বিদায় কতটা বিনয়ী এবং অহংকারমুক্ত হতে পারে, তাঁর এই আচরণ তারই প্রমাণ।

৩. জানাজা ও দাফন

মদিনার তৎকালীন গভর্নর (মতান্তরে মারওয়ান ইবনুল হাকাম) তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান। ইন্তেকালের পর তাঁকে মদিনার ঐতিহাসিক বিদায়ী কবরস্থান **জান্নাতুল বাকিতে**

অত্যন্ত মর্যাদার সাথে দাফন করা হয়, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যান্য পবিত্র স্ত্রী ও সাহাবীবৃন্দ শায়িত আছেন।

উম্মে হাবিবা (রা.) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও দুনিয়ার সমস্ত ক্ষোভ, অহংকার বা মনমালিন্য ধুয়ে-মুছে আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার যে ব্যাকুলতা দেখিয়েছিলেন, তা আজও মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বড় শিক্ষা।

হযরত সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা.)

হযরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.) ছিলেন আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্যতম পবিত্র স্ত্রী এবং উম্মুল মুমিনিন। তাঁর জন্ম ও শৈশবকাল মদিনার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত ঘটনাবহুল এবং রাজকীয় ছিল। কারণ, তিনি মদিনার এক প্রভাবশালী ইহুদি রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর জন্ম ও শৈশবের বিস্তারিত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. জন্ম ও বংশপরিচয়

হযরত সাফিয়া (রা.) আনুমানিক **৬১০ খ্রিস্টাব্দে** মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশলতিকা সরাসরি হযরত মুসা (আ.)-এর ভাই এবং আল্লাহর নবী **হযরত হারুন (আ.)**-এর সাথে গিয়ে মিলেছে। ফলে বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত।

- **পিতা:** হুয়াই ইবনে আখতাব, যিনি ছিলেন মদিনার বিখ্যাত এবং শক্তিশালী ইহুদি গোত্র **বনু নাযির**-এর প্রধান বা রাজা।
- **মাতা:** বাররা বিনতে সামাওয়াল, তিনিও আরেকটি প্রভাবশালী ইহুদি গোত্র **বনু কুরাইযা**-এর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন।

২. রাজকীয় শৈশব ও আদর-যত্ন

যেহেতু তাঁর পিতা ছিলেন গোত্রপ্রধান, তাই সাফিয়ার শৈশব কেটেছে চরম বিলাসিতা, রাজকীয় প্রটোকল এবং পরম আদরে। তিনি ছিলেন তাঁর পিতা এবং চাচা আবু ইয়াসিরের অত্যন্ত প্রিয় সন্তান। সাফিয়া (রা.) নিজেই তাঁর শৈশবের একটি স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন:

"আমি আমার পিতা ও চাচার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। তারা তাদের নিজেদের সন্তানদের চেয়েও আমাকে বেশি আদর করতেন। তারা যখনই কোথাও বের হতেন বা ঘরে ফিরতেন, অন্য সব শিশুকে বাদ দিয়ে আগে আমাকে বুকে টেনে নিতেন।"

৩. শৈশবে নবীজী (সা.)-এর আগমন ও পারিবারিক আবহ

সাফিয়া (রা.)-এর শৈশবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে যখন মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসেন। ইহুদি পন্ডিতরা তাদের কিতাব অনুযায়ী শেষ নবীর অপেক্ষায় ছিলেন। নবীজী (সা.) মদিনার পাশে কুবা-তে পৌঁছানোর পর সাফিয়ার পিতা হুয়াই এবং চাচা আবু ইয়াসির গোপনে তাঁকে দেখতে যান।

সেদিনের ঘটনা সাফিয়া (রা.) তাঁর নিজের চোখে এভাবে দেখেছিলেন:

"তারা যখন কুবা থেকে ফিরে এলেন, তখন দুজনেই ভীষণ ক্লান্ত ও চিন্তিত। আমি প্রতিদিনের মতো দৌড়ে তাদের কাছে গেলাম, কিন্তু তারা এতটাই মগ্ন ছিলেন যে আমার দিকে তাকালেনও না। আমি শুনলাম আমার চাচা আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করছেন, *'তিনি কি আসলেই সেই প্রতিশ্রুত নবী?'* পিতা উত্তর দিলেন, *'হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, তিনিই সেই নবী।'* চাচা আবার জিজ্ঞেস করলেন, *'তাহলে এখন তোমার সিদ্ধান্ত কী?'* আমার পিতা উত্তর দিলেন, *'যতদিন বেঁচে থাকব, তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতা করে যাব।'*"

এই ঘটনাটি সাফিয়ার কচি মনে গভীর দাগ কেটেছিল। পরিবারে নবীজী (সা.)-এর প্রতি তীব্র শত্রুতার আবহ থাকলেও, সাফিয়া অবচেতনভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্য নবী।

৪. রূপ, গুণ ও বুদ্ধিমত্তা

শৈশব থেকেই সাফিয়া ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং শান্ত স্বভাবের। ইহুদি রাজপরিবারের সন্তান হওয়ায় উচ্চশিক্ষা, শিষ্টাচার এবং নেতৃত্বসুলভ আচরণ তিনি পরিবার থেকেই রপ্ত করেছিলেন। তাঁর এই চমৎকার গুণাবলীর কারণে মদিনার ইহুদি সমাজে তাঁর ব্যাপক সুনাম ও মর্যাদা ছিল।

সংক্ষেপে, উম্মে হাবিবা (রা.)-এর মতো সাফিয়া (রা.)-এর জীবনও ছিল নাটকীয়। শৈশবে মদিনার যে রাজকীয় প্রাসাদে তিনি পরম আদরে বড় হয়েছিলেন, খায়বারের যুদ্ধের পর তাঁর জীবনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ইসলামের

ছায়াতলে এসে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী ও মুসলিম উম্মাহর মাতার আসনে সমাসীন হন।

হযরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.)-এর প্রথম বিবাহ, খায়বারের যুদ্ধ এবং পরবর্তীতে বন্দী হওয়ার ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নাটকীয়। নিচে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

১. প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ (ইসলাম পূর্ববর্তী জীবন)

যৌবনে পদার্পণ করার পর সাফিয়া (রা.)-এর রূপ, গুণ ও রাজকীয় মর্যাদার কারণে তাঁর বিয়ের জন্য বহু প্রস্তাব আসতে থাকে।

- **প্রথম বিয়ে:** প্রথমে তাঁর বিয়ে হয় বনু নাযির গোত্রের প্রখ্যাত ইহুদি কবি এবং যোদ্ধা **সালাম ইবনে মিশকাম**-এর সাথে। তবে এই বিয়ে বেশিদিন টেকেনি এবং তাদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ (ডিভোর্স) হয়ে যায়।
- **দ্বিতীয় বিয়ে:** এরপর তাঁর বিয়ে হয় খায়বারের বিখ্যাত দুর্গ 'কামুস'-এর অধিপতি এবং বনু নাযির গোত্রের তৎকালীন অন্যতম শীর্ষ নেতা **কিনানা ইবনুল রাবি**-এর সাথে। কিনানার সাথে বিয়ের পরই সাফিয়া খায়বারের রাজপ্রাসাদে বসবাস শুরু করেন।

২. বিয়ের রাতে সেই অলৌকিক স্বপ্ন

কিনানা ইবনুল রাবি-এর সাথে বিয়ের প্রথম রাতে সাফিয়া (রা.) একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন:

আকাশ থেকে উজ্জ্বল চাঁদটি যেন সরাসরি তাঁর কোলে এসে পড়ল।

ঘুম থেকে উঠে তিনি তাঁর স্বামী কিনানাকে এই স্বপ্নের কথা বলেন। কিনানা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সাফিয়ার মুখে জোরে থাপ্পড় মারে। থাপ্পড়ের চোটে সাফিয়ার চোখে ও মুখে কালচে দাগ পড়ে যায়। কিনানা চিৎকার করে বলেছিল, *"এর অর্থ হলো তুমি মদিনার সেই রাজার (হযরত মুহাম্মদ সা.) স্ত্রী হওয়ার আশা করছ!"* (পরবর্তীতে খায়বার বিজয়ের পর নবীজী সা. যখন সাফিয়ার চোখে এই দাগ দেখেছিলেন, তখন এর কারণ জানতে চাইলে সাফিয়া এই স্বপ্নের কথা বলেছিলেন)।

৩. খায়বারের যুদ্ধ এবং পরিবারের পতন (৭ম হিজরি / ৬২৮ খ্রিস্টাব্দ)

মদিনা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর বনু নাযির গোত্র খায়বারে গিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এর জবাবে ৭ম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী খায়বার আক্রমণ করে। এই যুদ্ধটি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী সাফিয়ার স্বামী কিনানার দুর্গ 'কামুস' অবরোধ করে এবং সেটি জয় করে। যুদ্ধে সাফিয়ার পিতা হুয়াই ইবনে আখতাব (যিনি আগেই উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলেন) এবং তাঁর স্বামী কিনানা ইবনুল রাবি দুজনেই নিহত হন। একই সাথে তাঁর ভাইও এই যুদ্ধে মারা যান।

৪. বন্দী হওয়ার ঘটনা

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর খায়বারের নারীদের বন্দী করা হয়, যার মধ্যে রাজপরিবারের পুত্রবধূ হিসেবে সাফিয়া (রা.)-ও ছিলেন।

সাহাবী হযরত দিহয়া কালবী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে যুদ্ধলব্ধ দাসীদের মধ্য থেকে একজন দাসী চাইলেন। নবীজী (সা.) তাকে বললেন, *"তুমি বন্দিশালায় যাও এবং যেকোনো একজনকে বেছে নাও।"* দিহয়া (রা.) বন্দিশালায় গিয়ে সাফিয়া বিনতে হুয়াইকে পছন্দ করলেন এবং নিজের জন্য নিয়ে নিলেন।

৫. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হস্তক্ষেপ

হযরত দিহয়া (রা.) যখন সাফিয়াকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন অন্য একজন সাহাবী (হযরত আসিম ইবনে উমর) দ্রুত নবীজী (সা.)-এর কাছে ছুটে এলেন। তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বনু নাযির এবং বনু কুরাইযার রাজকন্যা সাফিয়াকে দিহয়ার হাতে তুলে দিলেন? তিনি এত বড় বংশের মেয়ে যে, আপনার মর্যাদা ছাড়া অন্য কারও ঘরে তাঁকে মানায় না। তিনি কেবল আপনার জন্যই উপযুক্ত।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিষয়টি বুঝতে পারলেন। তিনি সাফিয়াকে অন্য একজন সাধারণ সাহাবীর দাসী হিসেবে রাখলে তা তাঁর রাজকীয় মর্যাদার জন্য অপমানজনক হতো। তাই নবীজী (সা.) দিহয়া (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন এবং সাফিয়াকে তাঁর সামনে উপস্থিত করতে বললেন।

নবীজী (সা.) সাফিয়াকে দেখে দিহয়া (রা.)-কে বললেন, *"তুমি বন্দীদের মধ্য থেকে অন্য যেকোনো একজনকে বেছে নাও।"* এরপর নবীজী (সা.) দিহয়াকে সাফিয়ার

পরিবর্তে অন্য দাসী প্রদান করে সন্তুষ্ট করেন এবং সাফিয়াকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেন।

বন্দী হওয়ার এই কঠিন মুহূর্তটিই ছিল সাফিয়ার জীবনের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট। একদিকে পিতা, স্বামী ও ভাইকে হারিয়ে তিনি চরম শোকগ্রস্ত ছিলেন, অন্যদিকে দাসী হওয়ার অপমান। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সান্নিধ্যে আসার পর তাঁর জীবনের এই চরম অন্ধকার মুহূর্তটিই ইসলামের ইতিহাসে 'উম্মুল মুমিনিন' বা বিশ্বাসীদের মাতা হওয়ার গৌরবময় অধ্যায়ে রূপ নেয়।

ইসলাম গ্রহণ ও রাসুল (সা.)এর সাথে বিয়ে

হযরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি অত্যন্ত মর্যাদাশীল ও শিক্ষণীয়। খায়বারের যুদ্ধে বন্দী হওয়ার পর তাঁর জীবন যেভাবে দাসত্ব থেকে ইসলামের সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে উন্নীত হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রস্তাব ও ইসলাম গ্রহণ

খায়বার যুদ্ধের পর বন্দী সাফিয়া (রা.)-কে যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর তাবুতে নিয়ে আসা হয়, তখন নবীজী (সা.) তাঁর সাথে একজন যুদ্ধবন্দীর মতো আচরণ করেননি। বরং তিনি সাফিয়ার রাজকীয় বংশমর্যাদার প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করেন।

নবীজী (সা.) প্রথমে তাঁর চোখের নিচের সেই আঘাতের দাগটি (যা স্বপ্নের কথা বলায় তাঁর প্রাক্তন স্বামী কিনানা দিয়েছিল) দেখতে পান এবং এর পেছনের গল্পটি শোনেন। এরপর রাসুল (সা.) অত্যন্ত নরম সুরে সাফিয়াকে দুটি চমৎকার বিকল্প বা চয়েস দেন। তিনি বলেন:

"হে সাফিয়া, তোমার পিতা আমার তীব্র বিরোধিতা ও শত্রুতা করে গেছেন। এখন তোমার সামনে দুটি পথ খোলা আছে—যদি তুমি তোমার পূর্বের ধর্ম ইহুদিবাদে অবিচল থাকতে চাও, তবে আমি তোমাকে এখনই মুক্ত করে দেব এবং তুমি তোমার গোত্রের লোকেদের কাছে ফিরে যেতে পারবে। আর যদি তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বেছে নাও (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করো), তবে আমি তোমাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করব।"

সাফিয়া (রা.) শৈশব থেকেই মনে মনে জানতেন যে মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্য নবী। তাই তিনি এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে উত্তর দিলেন:
"হে আল্লাহর রাসুল, আমি যখন বন্দিশালায় ছিলাম, তখনও ইসলামের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। আপনার আমন্ত্রণের আগেই আমি মনে মনে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। ইহুদি ধর্মে আমার আর কোনো আগ্রহ নেই, সেখানে আমার পিতা বা স্বামী কেউই আর বেঁচে নেই। আপনি আমাকে স্বাধীনতা ও কুফরির (অবিশ্বাস) মাঝে বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন; কিন্তু আমার কাছে স্বাধীনতার চেয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই বেশি প্রিয়।"

সাফিয়ার এই বুদ্ধিমত্তা ও আন্তরিক উত্তর শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে তাৎক্ষণিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন।

২. দেনমোহর ও বিয়ে

হযরত সাফিয়া (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বিয়ে করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। ইসলামের নিয়মানুযায়ী বিয়ের জন্য দেনমোহর নির্ধারণ করা আবশ্যক ছিল। এই বিয়ের ক্ষেত্রে রাসুল (সা.) একটি অনন্য ও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি **সাফিয়াকে দাসত্ব থেকে দেওয়া মুক্তিয়েই তাঁর বিয়ের দেনমোহর (মাহর)** হিসেবে নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ, সাফিয়ার স্বাধীনতাই ছিল তাঁর মোহরানা।

৩. বাসর রাত ও হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর পাহারা

খায়বার থেকে মদিনায় ফেরার পথে 'সাহবা' নামক একটি স্থানে মুসলিম কাফেলা তাঁবু ফেলে। সেখানেই রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত সাফিয়া (রা.)-এর বাসর রাত নির্ধারিত হয়।
এই রাতটিকে ঘিরে ইসলামের ইতিহাসে একটি চমৎকার ঘটনা রয়েছে। সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) সারারাত তলোয়ার হাতে রাসুল (সা.)-এর তাঁবুর চারপাশে টহল দিতে থাকেন। সকালবেলা রাসুল (সা.) তাঁবু থেকে বের হয়ে তাঁকে দেখে অবাক হন এবং জিজ্ঞেস করেন, *"আবু আইয়ুব, তুমি এখানে কী করছ?"*
আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) উত্তর দিলেন, *"হে আল্লাহর রাসুল! এই তরুণীটির পিতা, স্বামী ও স্বজনরা মাত্র কয়েকদিন আগে আপনার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। সে মাত্রই ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমার ভয় হচ্ছিল, অবুঝ মন নিয়ে সে রাতের*

আঁধারে আপনার কোনো ক্ষতি করে বসে কি না! তাই আমি সারারাত আপনার তাঁবু পাহারা দিয়েছি।" রাসুলুল্লাহ (সা.) আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর এই গভীর ভালোবাসা ও সতর্কতার কথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং তাঁর জন্য প্রাণভরে দোয়া করলেন।

৪. ওলিমা (বিয়ের ভোজ)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যান্য বিয়ের মতো এই বিয়েতে কোনো জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন বা মাংস-পোলাওয়ের ব্যবস্থা ছিল না। কাফেলার সাহাবীদের কাছে যার কাছে যা খাবার (যেমন: খেজুর, পনির, ঘি, ছাতু ইত্যাদি) ছিল, রাসুল (সা.) তা একসঙ্গে জমা করতে বলেন।

চামড়ার তৈরি একটি বড় দস্তরখানের ওপর এই খাবারগুলো মিশিয়ে এক ধরনের বিশেষ হালুয়া তৈরি করা হয়, যাকে আরবিতে 'হাইস' (Hays) বলা হয়। এটিই ছিল উম্মুল মুমিনিন হযরত সাফিয়া (রা.)-এর বিয়ের ঐতিহাসিক ওলিমা।

মর্যাদার আসন: মদিনায় পৌঁছানোর পর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর এই নতুন স্ত্রীকে অন্যান্য স্ত্রীদের মতোই সমান মর্যাদা ও অধিকার দান করেন। সাফিয়া (রা.) ইহুদি রাজকন্যার জীবন থেকে বের হয়ে মুসলিম উম্মাহর সম্মানিত মাতা (উম্মুল মুমিনিন) হিসেবে মদিনার পবিত্র সমাজে স্থায়ী আসন লাভ করেন।

মদিনায় যাওয়ার পর অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনিন বা সতীনদের সাথে হযরত সাফিয়া (রা.)-এর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল, তবে তা এক চমৎকার পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসার মাধ্যমে মধুর হয়ে উঠেছিল।

তিনি যেহেতু একটি অনারব ও ইহুদি রাজপরিবার থেকে এসেছিলেন এবং অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন, তাই মদিনার নারীদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে স্বভাবসুলভ কৌতূহল ও কিছুটা ঈর্ষা ছিল। তবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রজ্ঞা এবং সাফিয়া (রা.)-এর ধৈর্য ও নম্রতা সব দূরত্ব দূর করে দিয়েছিল।

নিচে তাঁদের সম্পর্কের প্রধান দিকগুলো আলোচনা করা হলো:

১. মদিনার নারীদের কৌতূহল ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর মন্তব্য

সাফিয়া (রা.) যখন প্রথম মদিনায় আসেন, তখন তাঁর অতুলনীয় রূপের কথা শুনে মদিনার বহু নারী তাঁকে দেখতে আসেন। তাদের মধ্যে ছদ্মবেশে হযরত আয়েশা (রা.)-ও ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) আয়েশা (রা.)-কে চিনে ফেলেন এবং আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, *"হে আয়েশা, তুমি সাফিয়াকে কেমন দেখলে?"*

হযরত আয়েশা (রা.) কিছুটা ঈর্ষা ও নারীদের স্বাভাবিক অহংকার থেকে উত্তর দিয়েছিলেন, *"আমি তো কেবল একজন ইহুদি মেয়েকে দেখলাম।"* তখন রাসুল (সা.) মৃদু হেসে তাঁকে সংশোধন করে দিয়ে বলেছিলেন, *"এমন বলো না আয়েশা, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাঁর ইসলাম অত্যন্ত চমৎকার।"*

২. "ইহুদি কন্যা" বলে খোটা এবং রাসুল (সা.)-এর সান্ত্বনা

সংসারের স্বাভাবিক নিয়মেই কখনো কখনো অন্যান্য স্ত্রীদের কথাবার্তায় সাফিয়ার ইহুদি বংশপরিচয় নিয়ে ইঙ্গিত আসত, যা সাফিয়া (রা.)-কে ভীষণ কষ্ট দিত।

একবার হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা.) কথার প্রসঙ্গে বলে ফেললেন, *"আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বংশের (কুরাইশ) মেয়ে এবং তাঁর চাচাতো বোন, তাই আমরা আপনার চেয়ে বেশি মর্যাদাবান।"* সাফিয়া (রা.) এতে কেঁদে ফেললেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘরে এসে সাফিয়ার কান্নার কারণ জানতে পেরে তাঁকে এক ঐতিহাসিক সান্ত্বনা বাণী শোনান। নবীজী (সা.) বলেন:

"তুমি কাঁদছ কেন সাফিয়া? তুমি তাদের জবাবে বুক ফুলিয়ে কেন বললে না—**'তোমরা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হও কী করে? যেখানে আমার পিতা হলেন আল্লাহর নবী হযরত হারুন (আ.), আমার চাচা হলেন আল্লাহর নবী হযরত মুসা (আ.) এবং আমার স্বামী হলেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)!'"**

নবীজী (সা.)-এর এই চমৎকার যুক্তি শোনার পর সাফিয়া (রা.) সমস্ত দুঃখ ভুলে যান এবং নিজের বংশ ও স্বামী নিয়ে অত্যন্ত গর্ববোধ করতে শুরু করেন। এরপর থেকে সতীনদের মাঝে এই নিয়ে আর কোনো কথা ওঠেনি।

৩. হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে মধুর সম্পর্ক ও উপহার বিনিময়

প্রথম দিকে কিছুটা দূরত্ব থাকলেও আস্তে আস্তে হযরত আয়েশা (রা.) এবং সাফিয়া (রা.)-এর মধ্যে গভীর সখ্যতা তৈরি হয়। সাফিয়া (রা.) রান্না করায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রায়ই সুস্বাদু খাবার রান্না করে রাসুল (সা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে পাঠাতেন।

একবার এক সফরে হযরত আয়েশা (রা.)-এর উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ে, অথচ সাফিয়ার কাছে অতিরিক্ত উট ছিল। রাসুল (সা.) সাফিয়াকে বললেন তাঁর একটি উট আয়েশাকে দিতে। সাফিয়া (রা.) সানন্দে তা দিয়ে দেন।

৪. জীবনের শেষ মুহূর্তের উদারতা

সাফিয়া (রা.) অন্য স্ত্রীদের কতটা ভালোবাসতেন, তা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর শয্যাশায়ী মুহূর্তের একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। রাসুল (সা.) যখন তীব্র অসুস্থ, তখন সাফিয়া (রা.) আবেগ আপ্লুত হয়ে বলেছিলেন, *"হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম! আপনার এই কষ্ট যদি আমার ওপর চলে আসত আর আপনি সুস্থ হয়ে যেতেন, তবে আমি ধন্য হতাম।"*

তাঁর এই কথা শুনে অন্যান্য স্ত্রীরা ইশারা-ইঙ্গিতে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিলেন (হয়তো তারা ভেবেছিলেন সাফিয়া লোকদেখানো কথা বলছেন)। রাসুলুল্লাহ (সা.) স্ত্রীদের এই ইশারা দেখে কঠোরভাবে তাদের নিষেধ করেন এবং বলেন, *"তোমরা এমন করছ কেন? আল্লাহর কসম, সাফিয়া তাঁর কথায় সম্পূর্ণ সত্যবাদী এবং আন্তরিক।"*

মদিনার জীবনে হযরত সাফিয়া (রা.) নিজের বিনয়, চমৎকার রান্না, উপহার আদান-প্রদান এবং রাসুল (সা.)-এর প্রতি অগাধ ভালোবাসার মাধ্যমে সমস্ত সতীনদের মন জয় করে নিয়েছিলেন। প্রথম দিকের ছোটখাটো মনমালিন্য ছাপিয়ে তিনি রাসুল (সা.)-এর পবিত্র অন্তঃপুরে একজন অত্যন্ত সম্মানিত 'উম্মুল মুমিনিন' হিসেবে সবার সাথে মিলেমিশে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

হযরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.)-এর অন্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি যে ভালোবাসা ছিল, তা ছিল অত্যন্ত গভীর, নিষ্কলুষ এবং অনন্য। শত্রুর কন্যা এবং যুদ্ধের বন্দী থেকে শুরু করে রাসুল (সা.)-এর চাদরের ছায়ায় আশ্রয় পাওয়া পর্যন্ত তাঁর এই ভালোবাসার রূপান্তর ছিল অত্যন্ত আবেগঘন।

নিচে রাসুল (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসার কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

১. সমস্ত শোক ভুলে রাসুল (সা.)-কে বেছে নেওয়া

খায়বারের যুদ্ধে সাফিয়া (রা.) তাঁর পিতা, স্বামী এবং ভাইকে হারিয়েছিলেন। যেকোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে এই তীব্র ক্ষোভ ও শোক কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব ছিল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন তাঁকে নিজের দায়িত্বে নেন এবং ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন সাফিয়া (রা.) তাঁর অতীতের সমস্ত পারিবারিক বেদনা ভুলে যান। তিনি বলেছিলেন, *"আমার কাছে স্বাধীনতা বা আমার গোত্রের চেয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই বেশি*

প্রিয়।" শত্রুর ঘরের সন্তান হয়েও রাসুল (সা.)-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি এমন তাৎক্ষণিক ও নিঃশর্ত ভালোবাসা সত্যিই বিরল।

২. রাসুল (সা.)-এর কষ্টের অংশীদার হওয়ার আকুলতা

রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে তীব্র জ্বরে ও অসুস্থতায় ভুগছিলেন, তখন উম্মাহাতুল মুমিনিনগণ (নবী পত্নীগণ) তাঁর চারপাশে জমা হয়েছিলেন। সাফিয়া (রা.) রাসুল (সা.)-এর কষ্ট দেখে নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন:

"হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কসম, আপনার এই সমস্ত কষ্ট ও রোগ যদি আমার ওপর চলে আসত আর আপনি সুস্থ হয়ে যেতেন, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম।"

অন্যান্য সতীনরা এটিকে স্বাভাবিক নারীদের আবেগ মনে করলেও, রাসুল (সা.) স্বয়ং সাফিয়ার এই ভালোবাসার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেছিলেন, *"তোমরা ওকে ভুল ভেবো না, আল্লাহর কসম, সাফিয়া তাঁর কথায় সম্পূর্ণ সত্যবাদী এবং আন্তরিক।"*

৩. রাসুল (সা.)-এর সম্মানের প্রতি সর্বোচ্চ সতর্কতা

সাফিয়া (রা.) সর্বদা খেয়াল রাখতেন যেন তাঁর কোনো আচরণের কারণে রাসুল (সা.)-এর সম্মান বা মর্যাদায় সামান্যতম আঁচ না লাগে। একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে:

একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) মসজিদে ইতিকাফ করছিলেন। সাফিয়া (রা.) রাতে তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। কথা বলা শেষ হলে রাসুল (সা.) তাঁকে অন্ধকার রাতে একাকী না ছেড়ে তাঁর ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে বের হলেন। পথিমধ্যে দুজন আনসারী সাহাবী তাঁদের দেখে দ্রুত হেঁটে চলে যেতে লাগলেন। রাসুল (সা.) তাঁদের ডেকে বললেন, *"শোনো, তোমরা গতি থামাও, এটি আমার স্ত্রী সাফিয়া।"* সাহাবীরা লজ্জিত হয়ে বললেন, *"সুবহানাল্লাহ, ইয়া রাসুলুল্লাহ! (আমরা কি আপনার প্রতি কোনো সন্দেহ করতে পারি?)"* তখন রাসুল (সা.) বললেন, শয়তান মানুষের রক্তে চলাচল করে, তাই তিনি চাননি তাদের মনে কোনো কুধারণা আসুক।

এই ঘটনায় সাফিয়া (রা.) রাসুল (সা.)-এর এই সতর্কতা ও প্রজ্ঞাকে সারাজীবন গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতেন।

৪. সুস্বাদু খাবার ও সেবার মাধ্যমে ভালোবাসা

সাফিয়া (রা.) মদিনার অন্যান্য স্ত্রীদের চেয়ে অনেক চমৎকার রান্না করতে পারতেন। তিনি জানতেন রাসুল (সা.) কোন খাবারগুলো পছন্দ করেন। তাই তিনি প্রায়ই অত্যন্ত যত্ন সহকারে সুস্বাদু খাবার রান্না করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরে পাঠাতেন, এমনকি তা যখন অন্য স্ত্রীদের পালা থাকত তখনও। রাসুল (সা.)-কে একটুখানি তৃপ্ত করার এই প্রচেষ্টা ছিল তাঁর ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ।

হযরত সাফিয়া (রা.)-এর ভালোবাসা শুধু মুখের কথায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পরও আমৃত্যু তাঁর সুন্নাহর প্রতি অনুগত ছিলেন এবং রাসুল (সা.)-এর পবিত্র স্মৃতিগুলোকে আগলে রেখে মদিনায় এক ইবাদতগুজার জীবন কাটান।

সাফিয়া (রা.) ইন্তেকাল

হযরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.)-এর ইন্তেকাল বা মৃত্যুর ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি প্রায় চার দশক বেঁচে ছিলেন এবং এই দীর্ঘ সময় তিনি মদিনায় ইবাদত-বন্দেগি, দান-সদকা এবং রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহ চর্চার মাধ্যমে অতিবাহিত করেন।

তাঁর ইন্তেকালের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. ইন্তেকালের সময় ও বয়স

হযরত সাফিয়া (রা.) আনুমানিক **৫০ হিজরি বা ৫২ হিজরি** (৬৭০ বা ৬৭২ খ্রিস্টাব্দে) মদিনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন। সে সময় ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকাল চলছিল। ইন্তেকালের সময় উম্মুল মুমিনিন হযরত সাফিয়ার বয়স হয়েছিল প্রায় **৬০ থেকে ৬২ বছর**।

২. ঐতিহাসিক জান্নাতুল বাকিতে দাফন

মদিনায় ইন্তেকাল করার পর তৎকালীন মদিনার গভর্নর (মতান্তরে মারওয়ান ইবনুল হাকাম) তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান। জানাজা শেষে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে মদিনার ঐতিহাসিক কবরস্থান **জান্নাতুল বাকিতে** (বাকি আল-গারকাদ) উম্মাহাতুল মুমিনিনের (নবী পত্নীগণ) পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

৩. মৃত্যুর আগে শেষ উদারতা ও অসিয়ত

হযরত সাফিয়া (রা.) শৈশব থেকেই বিপুল ধন-সম্পদের মধ্যে বড় হয়েছিলেন এবং খায়বারের যুদ্ধের পরও তাঁর নিজস্ব কিছু সম্পত্তি ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল।

মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তির ব্যাপারে একটি ঐতিহাসিক অসিয়ত (উত্তরাধিকার নামা) করে যান:

- তিনি তাঁর মোট সম্পত্তির **এক-তৃতীয়াংশ (১/৩ অংশ)** তাঁর এক ভাগ্নেকে (যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, ইহুদি ছিলেন) দেওয়ার অসিয়ত করেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের উদারতার এটি একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।
- বাকি সম্পত্তি তিনি আল্লাহর রাস্তায় এবং মদিনার গরিব-দুঃখীদের মাঝে দান করার নির্দেশ দিয়ে যান।

হযরত সাফিয়া (রা.)-এর ইন্তেকালের মাধ্যমে মদিনার বুক থেকে মুছে যায় এমন এক পবিত্র জীবন, যিনি ইহুদি রাজকন্যার আসন ছেড়ে ইসলামের 'উম্মুল মুমিনিন' বা বিশ্বাসীদের মাতার আসনকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন। মদিনার জান্নাতুল বাকির মাটিতে তিনি আজও শান্তিতে শায়িত আছেন।

হযরত মাইমুনা বিনতে আল হারিস (রা.)

হযরত মাইমুনা বিনতে হারিস (রা.) ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সর্বশেষ বিবাহিত স্ত্রী এবং উম্মুল মুমিনিন (বিশ্বাসীদের মাতা)। তাঁর জন্ম ও শৈশবকাল মক্কার এক ঐতিহ্যবাহী এবং প্রভাবশালী পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল।

তাঁর জন্ম, বংশপরিচয় ও শৈশবের বিস্তারিত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. জন্ম ও আসল নাম

হযরত মাইমুনা (রা.) আনুমানিক **৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে** মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

- **আসল নাম:** তাঁর জন্মের পর নাম রাখা হয়েছিল **'বাররা'** (যার অর্থ পুণ্যবতী)। পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাথে বিয়ের পর এই নাম পরিবর্তন করে **'মাইমুনা'** (যার অর্থ বরকতময় বা ধন্য) রাখেন।

২. সম্ভ্রান্ত বংশপরিচয় ও মক্কার প্রভাব

তিনি মক্কার অত্যন্ত সম্মানিত এবং প্রভাবশালী **হিলাল ইবনে عامر** (বনু হিলাল) গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এই গোত্রটি তাদের বীরত্ব ও আতিথেয়তার জন্য আরবে বিখ্যাত ছিল।

- **পিতা:** হারিস ইবনে হাজন, যিনি ছিলেন মক্কার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি।
- **মাতা:** হিন্দ বিনতে আওফ। আরবের ইতিহাসে সাফিয়ার মাতাকে **"আরবের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শাশুড়ি"** (আকরামু আজুজিন ফিল আরদ) বলা হতো। কারণ, তাঁর মেয়েরা আরবের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও মহান ব্যক্তিদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

৩. বোনদের গৌরবময় নেটওয়ার্ক ও শৈশবের পরিবেশ

মাইমুনা (রা.)-এর শৈশব কেটেছে এমন এক পারিবারিক আবহে, যা পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে এক বিশাল ভূমিকা রেখেছিল। তাঁর আপন ও সৎ বোনদের তালিকা দেখলেই বোঝা যায় তাঁর শৈশবের পরিবেশ কতটা উচ্চমর্যাদার ছিল:

- তাঁর আপন বোন **উম্মুল ফাদল (লুবাবা আল-কুবরা)** ছিলেন রাসুল (সা.)-এর আপন চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর স্ত্রী এবং বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মাতা।
- তাঁর আরেক বোন **আসমা বিনতে আওফ** ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগের বীর হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) এবং পরবর্তীতে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর স্ত্রী।
- তাঁর আরেক বোন **যয়নব বিনতে খুযায়মা (রা.)** ছিলেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আরেকজন পবিত্র স্ত্রী (যিনি উম্মুল মাসাকিন বা মিসকিনদের মাতা নামে পরিচিত ছিলেন)।
- তাঁর আপন ভাগ্নে ছিলেন ইসলামের মহান সেনাপতি **হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)**।

এমন একটি মায়াবী ও অভিজাত পরিবারে বড় হওয়ার কারণে মাইমুনা (রা.) শৈশব থেকেই অত্যন্ত বিচক্ষণ, মিষ্টভাষী, দয়াশীল এবং উচ্চ নৈতিক গুণসম্পন্ন হিসেবে গড়ে ওঠেন।

হযরত মাইমুনা (রা.)-এর শৈশব ও কৈশোর মক্কার এক বিশাল ও প্রভাবশালী পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে কেটেছিল। এই পারিবারিক আভিজাত্য এবং তাঁর নিজস্ব চমৎকার চরিত্রের কারণেই পরবর্তীতে তিনি মক্কা বিজয়ের ঠিক আগে আরবের সবচেয়ে সম্মানিত নারী—'উম্মুল মুমিনিন' হওয়ার গৌরব লাভ করেন।

হযরত মাইমুনা বিনতে হারিস (রা.)-এর প্রথম বিবাহ এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি মক্কার কুরাইশ বংশের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নিচে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

১. প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ (ইসলাম পূর্ববর্তী জীবন)

যৌবনে পদার্পণ করার পর ইসলামের আলো মক্কায় ছড়িয়ে পড়ার আগেই তৎকালীন আরব সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

- **প্রথম বিবাহ:** মাইমুনা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে হয় তায়েফের বনু সাকীফ গোত্রের বিখ্যাত ব্যক্তি **মাসউদ ইবনে আমর আল-সাকাফী**-এর সাথে। তবে এই বৈবাহিক জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তাদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় বিবাহবিচ্ছেদ (ডিভোর্স) ঘটে।
- **দ্বিতীয় বিবাহ:** প্রথম বিয়ের পর মক্কার কুরাইশ বংশের বনু মালিক ইবনে কিনানা শাখার অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি **আবু রুহম ইবনে আবদুল উযযা**-এর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। কিন্তু ৭ম হিজরির (৬২৯ খ্রিস্টাব্দ) শুরুর দিকে তাঁর এই দ্বিতীয় স্বামী মারা যান।

মাত্র ৩৫ বছর বয়সে মাইমুনা (রা.) বিধবা হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি মক্কায় তাঁর আপন বোন উম্মুল ফাদল (লুবাবা আল-কুবরা) এবং ভগ্নিপতি—নবীজী (সা.)-এর আপন চাচা **হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.)**-এর আশ্রয়ে বসবাস করতে শুরু করেন।

২. ইসলাম গ্রহণ

হযরত মাইমুনা (রা.) কখন এবং কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে দুটি বিবরণ পাওয়া যায়:

- **মক্কার প্রাথমিক যুগ (মতান্তরে):** কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, তাঁর বোন উম্মুল ফাদল (যিনি নারীদের মধ্যে হযরত খাদিজা রা.-এর পর দ্বিতীয় মুসলিম ছিলেন) এবং ভগ্নিপতি হযরত আব্বাস (রা.)-এর প্রভাবে তিনি মক্কাতেই ইসলামের প্রথম যুগে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে মক্কার কাফেরদের ভয়ে তিনি তা প্রকাশ করেননি।
- **হুদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী সময় (সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত):** অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে, ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে (৬ষ্ঠ হিজরি) মক্কার কুরাইশদের সাথে

মুসলিমদের 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির পর মক্কার পরিবেশ কিছুটা শান্ত হলে এবং ইসলামের বিজয় সুস্পষ্ট হতে দেখে মাইমুনা (রা.) আনুষ্ঠানিকভাবে ও প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তিনি মনে-প্রাণে আল্লাহর একত্ববাদ এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মক্কার পৌত্তলিক সমাজ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নেন এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হন।

টার্নিং পয়েন্ট: বিধবা ও একাকী জীবনে ইসলাম গ্রহণ করার পর মাইমুনা (রা.)-এর একমাত্র অভিভাবক ছিলেন তাঁর ভগ্নিপতি হযরত আব্বাস (রা.)। এই আব্বাস (রা.)-এর মাধ্যমেই পরবর্তীতে ৭ম হিজরিতে উমরাতুল কাযা বা কাজা উমরাহ্ আদায়ের সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত মাইমুনা (রা.)-এর ঐতিহাসিক বিবাহের পথ সুগম হয়েছিল।

রাসুল (সা.) এর সাথে বিয়ে

হযরত মাইমুনা বিনতে হারিস (রা.)-এর সাথে আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে বেশ অনন্য এবং রাজনৈতিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের সর্বশেষ বিবাহিত স্ত্রী।

৭ম হিজরিতে (৬২৯ খ্রিস্টাব্দ) রাসুল (সা.) যখন সাহাবীদের নিয়ে 'উমরাতুল কাযা' বা কাজা উমরাহ্ আদায় করতে মক্কায় আসেন, তখন এই ঐতিহাসিক বিয়ের অধ্যায়টি শুরু হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. বিয়ের প্রস্তাব ও অভিভাবকত্ব

হুদায়বিয়ার চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুসলিমরা মাত্র ৩ দিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি পেয়েছিলেন। মক্কায় অবস্থানকালেই হযরত মাইমুনা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বিয়ে করার তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

তিনি তাঁর বিয়ের যাবতীয় দায়িত্ব ও অভিভাবকত্ব অর্পণ করেন তাঁর ভগ্নিপতি এবং নবীজী (সা.)-এর আপন চাচা **হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.)**-এর ওপর। হযরত আব্বাস (রা.) তখন সরাসরি রাসুল (সা.)-এর কাছে গিয়ে মাইমুনার বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন এবং ৪০০ দিরহাম দেনমোহর (মাহর) ধার্য করে তাদের আকদ সম্পন্ন হয়।

২. মক্কার কাফেরদের বাধা

বিয়ের আকদ সম্পন্ন হওয়ার পরপরই মুসলিমদের মক্কায় থাকার ৩ দিনের সময়সীমা শেষ হয়ে যায়। কুরাইশ কাফেরদের প্রতিনিধিরা রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে অত্যন্ত কঠোরভাবে মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার তাগিদ দেয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) কুরাইশদের সাথে সম্পর্ক আরও মধুর করার জন্য একটি চমৎকার প্রস্তাব দিয়ে বললেন, *"আমি তো এখানে বিয়ে করেছি। তোমরা যদি আমাকে অনুমতি দাও, তবে আমি মক্কাতেই বিয়ের অলিমার (ভোজের) আয়োজন করি এবং আপনাদের সবাইকে দাওয়াত দিই।"* কিন্তু কুরাইশরা ইসলামের প্রতি তাদের শত্রুতার কারণে অত্যন্ত রুক্ষভাবে উত্তর দিল, *"আমাদের আপনার অলিমার খাবারের কোনো প্রয়োজন নেই, আপনি এখনই মক্কা ত্যাগ করুন।"* চুক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়ে রাসুল (সা.) তখনই সাহাবীদের নিয়ে মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

৩. 'সারিফ' নামক স্থানে বাসর ও অলিমার আয়োজন

মক্কা থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে মদিনার পথে **'সারিফ'** (Saraf) নামক একটি চমৎকার উপত্যকায় এসে মুসলিম কাফেলা তাবু ফেলে। এই সারিফ নামক স্থানেই রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত মাইমুনা (রা.)-এর বাসর রাত অনুষ্ঠিত হয় এবং এখানেই সাহাবীদের নিয়ে সাধারণ ওলিমার (বিয়ের ভোজ) আয়োজন করা হয়।

৪. কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়া

ইসলামী গবেষকদের মতে, হযরত মাইমুনা (রা.)-এর এই বিয়ের ঘটনার প্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আহযাবের ৫০ নম্বর আয়াতটি নাজিল হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছে:

"...এবং কোনো মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে এবং নবীও তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে, তবে এটি বিশেষভাবে আপনার (নবীর) জন্য বৈধ—অন্য মুমিনদের জন্য নয়..."

হযরত মাইমুনা (রা.) রাসুল (সা.)-এর প্রতি এতটাই নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন যে, বিয়ের চূড়ান্ত আলোচনার সময় তিনি উটের পিঠে চড়া অবস্থায় ছিলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠেছিলেন, *"এই উট এবং উটের ওপর যা কিছু আছে (অর্থাৎ আমি নিজে), সবকিছুই আল্লাহর রাসুলের জন্য উৎসর্গীকৃত।"*

একটি কাকতালীয় ও ঐতিহাসিক কাকতাল: হযরত মাইমুনা (রা.)-এর জীবনের সবচেয়ে চমৎকার বিষয় হলো, যে **'সারিফ'** নামক স্থানে ৭ম হিজরিতে রাসুল (সা.)-এর সাথে তাঁর বাসর হয়েছিল, দীর্ঘ ৫১ বছর পর ৬১ হিজরিতে তাঁর মৃত্যুর পর ঠিক সেই একই স্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত মাইমুনা বিনতে হারিস (রা.)-এর ইবাদতের জীবন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অত্যন্ত গভীর ও অনুকরণীয়। তিনি শুধু রাসুল (সা.)-এর স্ত্রীই ছিলেন না, বরং তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী এবং ঘরের ভেতরের একজন মহান ইবাদতগুজার সঙ্গী ছিলেন।

নিচে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন এবং রাসুল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার প্রধান দিকগুলো তুলে ধরা হলো:

১. অনন্য ইবাদতের জীবন ও তাকওয়া

হযরত মাইমুনা (রা.) তাঁর সমসাময়িক নারীদের মধ্যে আল্লাহর ভীতি (তাকওয়া) এবং ইবাদতের দিক থেকে অনন্য ছিলেন। উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রা.) স্বয়ং তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন:

"মাইমুনা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় পেতেন (তাকওয়াবান ছিলেন) এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি বজায় রাখতেন।"

- **নফল ইবাদত ও দান-সদকা:** তিনি দিন-রাত আল্লাহর জিকির, কোরআন তিলাওয়াত এবং নফল সালাতে মগ্ন থাকতেন। তাঁর কাছে কোনো অর্থ বা সম্পদ এলে তিনি তা নিজের জন্য জমিয়ে না রেখে মদিনার গরিব-দুঃখীদের মাঝে এবং দাসমুক্তির কাজে দান করে দিতেন।
- **দাস মুক্তি:** তিনি বহু ক্রীতদাসকে নিজের অর্থ দিয়ে কিনে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করে দিয়েছিলেন, যা ইসলামের অন্যতম বড় ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়।

২. রাসুল (সা.)-কে নিজের সবকিছু সঁপে দেওয়া

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা এতই তীব্র ছিল যে, বিয়ের প্রস্তাব চূড়ান্ত হওয়ার খবর যখন তাঁর কাছে পৌঁছায়, তখন তিনি উটের পিঠে বসা ছিলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি তখনই বলে উঠেছিলেন, *"এই উট এবং উটের ওপর যা কিছু আছে (অর্থাৎ আমি নিজে), সবকিছুই আল্লাহর রাসুলের জন্য উৎসর্গীকৃত।"* তিনি কোনো

দুনিয়াবী স্বার্থ বা মোহ ছাড়াই সম্পূর্ণ দ্বীনের খাতিরে রাসুল (সা.)-এর জীবনসঙ্গী হতে চেয়েছিলেন।

৩. রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহ ও আরামের প্রতি খেয়াল রাখা

স্ত্রী হিসেবে তিনি সর্বদা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্বাচ্ছন্দ্য ও সুন্নাহর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন।

- **গোসলের পানি প্রস্তুত রাখা:** রাসুল (সা.) কখন ইবাদত বা পবিত্রতার জন্য গোসল করবেন, তা মাইমুনা (রা.) আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারতেন। তিনি নিজ হাতে রাসুল (সা.)-এর গোসলের পানি ও কাপড়ের ব্যবস্থা করে রাখতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত সহিহ হাদিসে এসেছে, মাইমুনা (রা.) রাসুল (সা.)-এর গোসলের খুঁটিনাটি সুন্নাহ ও নিয়মগুলো নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন, যা আজ পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য গোসলের বিধান হিসেবে অনুসৃত হয়।
- **রোজা অবস্থায় ভালোবাসা:** একবার প্রচণ্ড গরমের এক সফরে রাসুল (সা.) এবং হযরত মাইমুনা (রা.) ছাড়া কাফেলার আর কেউই রোজা রাখেনি। রাসুল (সা.)-এর কষ্টের সঙ্গী হতেই তিনি সেই কঠিন পরিস্থিতিতেও নফল রোজা রেখেছিলেন।

৪. দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা ও হাদিস বর্ণনা

রাসুল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার অন্যতম প্রকাশ ছিল তাঁর বাণী ও কাজগুলোকে মুখস্থ রাখা এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে প্রায় **৭৬টি হাদিস** বর্ণনা করেছেন।

তাঁর আপন ভাগ্নে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রায়ই খালা মাইমুনার ঘরে এসে রাত কাটাতেন, যাতে তিনি রাতে রাসুল (সা.)-এর তাহাজ্জুদ সালাত ও রাতের ইবাদতের পদ্ধতি সরাসরি দেখতে ও শিখতে পারেন। মাইমুনা (রা.) অত্যন্ত যত্ন সহকারে ভাগ্নেকে রাসুল (সা.)-এর জীবনের এই আধ্যাত্মিক দিকগুলো শিক্ষা দিতেন।

সংক্ষেপে:

হযরত মাইমুনা (রা.)-এর জীবন ছিল একাধারে **তাকওয়া, সততা এবং রাসুল (সা.)-এর প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসার** এক উজ্জ্বল দলিল। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পরও তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ইবাদতের ধারাবাহিকতা বজায়

রেখেছিলেন এবং নিজেকে একজন আদর্শ 'উম্মুল মুমিনিন' হিসেবে মদিনার সমাজে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন।

মাইমুনা (রা.) এর ইন্তেকাল

উম্মুল মুমিনিন হযরত মাইমুনা বিনতে হারিস (রা.)-এর মৃত্যুর ঘটনা এবং 'সারিফ' নামক স্থানটির ইতিহাস ইসলামের ইতিহাসে এক অদ্ভুত ও অলৌকিক কাকতালীয় অধ্যায়। যে স্থানে তাঁর বৈবাহিক জীবনের সূচনা হয়েছিল, ঠিক সেই একই স্থানেই তাঁর জীবনের অবসান ঘটে।

১. ইন্তেকালের ঘটনা

হযরত মাইমুনা (রা.) আনুমানিক **৬১ হিজরি** (৬১ হিজরি মতটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য, তবে কোনো কোনো বর্ণনায় ৫১ হিজরিও বলা হয়েছে) ইন্তেকাল করেন। সে সময় মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর প্রায় ৫০ বছর পার হয়ে গিয়েছিল।

মৃত্যুর সময় তিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। তখন তিনি তাঁর সাথে থাকা লোকদের নির্দেশ দিয়ে বলেন:

"আমাকে তোমরা দ্রুত মক্কার সীমানার বাইরে নিয়ে চলো। কারণ আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে মক্কার ভেতরে মৃত্যু বরণ না করার ব্যাপারে (কিংবা মক্কার বাইরে বিদায় নেওয়ার ব্যাপারে) এক বিশেষ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।"

তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী কাফেলা তাঁকে মক্কা থেকে মদিনার অভিমুখে নিয়ে রওনা হয়। কিন্তু মক্কা থেকে মাত্র কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করার পরই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

২. সারিফ (Saraf) নামক স্থানের সেই ঐতিহাসিক কাকতালীয়

হযরত মাইমুনা (রা.) ঠিক যে জায়গাটিতে এসে ইন্তেকাল করেন, তার নাম ছিল **'সারিফ' (سرف)**। এই স্থানটি তাঁর জীবনের সাথে এক অবিচ্ছেদ্য সুতোয় বাঁধা ছিল:

- **৭ম হিজরি (মিলন):** মক্কার কাফেরদের বাধার কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কায় বিয়ের বাসর করতে পারেননি। মক্কা থেকে বের হয়ে এই **সারিফ** নামক স্থানেই রাসুল (সা.)-এর সাথে হযরত মাইমুনার বাসর রাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ওলিমা হয়েছিল।

- **৬১ হিজরি (বিদায়):** দীর্ঘ ৫১ বছর পর, ঠিক সেই একই স্থানে, একই গাছের ছায়ায় যেখানে তাঁর বাসর হয়েছিল, সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

তাঁর জানাজার নামাজ পড়িয়েছিলেন তাঁর আপন ভাগ্নে, ইসলামের প্রখ্যাত পণ্ডিত **হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)**। খালাকে কবরে নামানোর সময় ইবনে আব্বাস (রা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, *"ইনি আল্লাহর রাসূলের পবিত্র স্ত্রী, তাই ওঁর খাটিয়াটি তোলার সময় তোমরা আলতোভাবে ও নম্রতার সাথে তোলো এবং কোনো ঝাঁকুনি দিও না।"* এরপর সারিফ উপত্যকাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

ইতিহাসের শিক্ষা: আরবের কবি ও ইতিহাসবিদরা উম্মুল মুমিনিন হযরত মাইমুনা (রা.)-এর জীবন ও মৃত্যুর এই স্থানটিকে প্রকৃতির এক পরম বিস্ময় বলে উল্লেখ করেন। মানুষের জীবনচক্র যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, ঠিক সেখানেই এসে শেষ হওয়া—ইসলামের ইতিহাসে এটি কেবল হযরত মাইমুনা (রা.)-এর ভাগ্যেই ঘটেছিল

পরিশেষ :

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বৈবাহিক জীবন ছিল অত্যন্ত পবিত্র, বৈচিত্র্যময় এবং মানবজাতির জন্য এক মহান শিক্ষালয়। আধুনিক যুগের চশমা বা কোনো সংকীর্ণ মানসিকতা দিয়ে নয়, বরং তৎকালীন আরবের সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের দিক থেকে তাঁর বৈবাহিক জীবনকে মূল্যায়ন করতে হয়। তাঁর পবিত্র জীবন ও স্ত্রীদের (উম্মাহাতুল মু'মিনীন) সাথে তাঁর আচরণ থেকে যে মূল শিক্ষাগুলো আমরা পাই:

- **সামাজিক ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা:** নবীজির অধিকাংশ বিবাহই ছিল কোনো না কোনো গোত্রীয় শত্রুতা দূর করা, যুদ্ধবিধ্বস্ত বা বিধবা নারীদের আশ্রয় ও সম্মান দেওয়া, কিংবা বিভিন্ন প্রভাবশালী গোত্রের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি করে ইসলামের ভিত্তি মজবুত করার কৌশলগত ও ঐশ্বরিক সিদ্ধান্ত।
- **দাম্পত্যে সর্বোত্তম আদর্শ:** তিনি কেবল একজন নবী বা রাষ্ট্রনেতা ছিলেন না, বরং ঘরের ভেতর ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী। স্ত্রীদের সাথে তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত রোমান্টিক, আনন্দময় এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ। তিনি নিজেই বলেছেন, *"তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।"*
- **নারীর ক্ষমতায়ন ও দ্বীন শিক্ষা:** রাসুল (সা.)-এর স্ত্রীবর্গ, বিশেষ করে হযরত আয়েশা (রা.), ইসলামের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের হাজার হাজার হাদিস

সংরক্ষণ ও বর্ণনা করেছেন। নবীজির ঘরগুলো ছিল মূলত নারীদের জন্য ইসলামের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, যার মাধ্যমে মুসলিম নারীরা দ্বীনের গভীর জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মূল কথা: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বৈবাহিক জীবন ভোগবিলাসের জন্য ছিল না, বরং তা ছিল আল্লাহর নির্দেশে এক বিশাল সামাজিক ও দ্বীনি দায়িত্ব পালনের অংশ। ঘরে এবং বাইরে তাঁর সততা, স্ত্রীদের প্রতি নিখুঁত ন্যায়বিচার এবং গভীর ভালোবাসার এই অনন্য সমন্বয় কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মুসলিম পরিবারের জন্য একটি শাশ্বত ও অনুকরণীয় গাইডলাইন।